উপন্যাস

কিশোরী

ইমদাদুল হক মিলন

নেড়ির লগে সই পাতাইলাম

কিশোরী, এই কিশোরী।

কী ?

তুমি একলা একলা মুড়ি খাইতাছো ক্যান ?

তয় কী করুম ? দোকলা দোকলা খামু ?

হ।

দোকলা পামু কই ?

এই যে আমি! আমিই তো তোমার দোকলা।

যা ভাগ! তুই একটা নেড়িকুত্তা। আমি যখনই বারান্দায় বইসা কিছু খাই আর কই থিকা যে তুই আইসা জোটছ ? এই, তুই থাকছ কই রে ? কোনদিক দিয়া বাগানবাড়িতে আইসা ঢোকছ ?

নেড়িটার গায়ের রং ধূসর। একদম শেয়ালের মতো। মাদি কুকুর। রোগা পটকা, সারাক্ষণ পেটে খিদে নিয়ে ঘুরে বেড়ানো কুকুর। কিশোরীর কথা শুনে অদ্ভুত এক আনন্দে লেজ নাড়ে। মুখটা আদুরে আদুরে করে তেরো-চৌদ্দ বছর বয়সী মেয়েটির দিকে তাকিয়ে থাকে। দেও না একটু মুড়ি ?

এলুমিনিয়ামের ছোট সাইজের একটা গামলায় মুড়ি নিয়েছে কিশোরী। গুড় নিয়েছিল একদলা। গুড়টা অনেকখানি খেয়েছে, মুড়ি রয়ে গেছে বেশ কিছু। একমুঠ মুড়ি মুখে দিয়ে এককামড় গুড় খেল সে। কুকুরটার দিকে ছুড়ে দিল একমুঠ। নেড়ি সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ল মুড়ির ওপর।

তোর নাম কী রে ?

নাম নাই। নেড়ি কুত্তার আবার নাম থাকে নাকি ?

তোর একখান নাম দিমু ?

দেও।

তোর নাম হইল, তোর নাম হইল... আরে নাম তো খুঁইজা পাই না।

পাইবা। আরো খোঁজো।

বাগানবাড়িটার সামনের দিকে যতদূর চোখ যায় তাকাল কিশোরী। নানা রকমের গাছপালা, সবুজ ঘাসের মাঠ, ফুল পাতাবাহারের ঝাড়, পুকুর, বাংলো ধরনের ঘর, সকালবেলার রোদ পড়েছে গেটের দিকে চলে যাওয়া রাস্তায়। এসবের ভিতর নেড়ি কুকুরটার একটা নাম খুঁজল সে।

কী নাম দেওয়া যায়, কী নাম দেওয়া যায়!

যাহ্ কিছুই তো মনে আসতেছে না। কুত্তাটা মাদি। এইটার সঙ্গে সই পাতাইলে কেমুন হয় ? এই বাড়ির আশপাশে কোনো বাড়িঘর নাই। বাড়ির চারদিকে ধানের ক্ষেত। দূরে দূরে গ্রাম, গ্রামে ঘরবাড়িও আছে। সেইসব ঘরবাড়িতে যেতে হয় ধানক্ষেতের ভিতর দিয়া। আর নয়তো বাগানবাড়ির সামনের দিককার রাস্তা দিয়া। আমি কোনোদিন যাই নাই। আমার বয়সী কোনো মাইয়ারে চিনি না। কার লগে সই পাতামু ? নেড়ির লগেই পাতাই।

এই, তুই আমার সই হবি ?

সই কারে কয় ?

সই হইল বন্ধু। দোস্ত।

হমু। তয় আমার একখান কথা আছে।

কী কথা ?

আমারে এই বাড়িতে থাকতে দেওন লাগবো।

দিমু।

খাওন দেওন লাগবো।

কী খাওন ?

তুমি যা খাও, তাই।

ভাত পানি মাছ তরকারি, গুড়মুড়ি এইসব ?

পুরাপুরি এইসব না। ধরো মাছের কাঁটাকোটা, পচাধচা ফেলনা ভাত তরতারি। গুড়ের দরকার নাই, একটু মুড়ি দিলেই হইব।

আইচ্ছা দিমু নে।

তয় আমি তোমার সই হইলাম।

কিন্তু তোর তো কোনো নাম পাইতাছি না।

নামের কাম কী ? সইয়ের নাম লাগে না।

এই তো নাম পাইয়া গেছি। তোর নামই সই।

আইচ্ছা ঠিক আছে।

কেমুন নাম ? ভালো না ?

হ ভালো।

খালি ভালো ?

না খুব ভালো।

তয় তোরে এখন একবার নাম ধইরা ডাকি ?

ডাকো।

সই ও সই, সই।

মুড়ি খাওয়া শেষ করে নেড়িটা তখন আবার লেজ নাড়ছে। গভীর আগ্রহে তাকিয়ে আছে কিশোরীর দিকে। যদি আরেক মুঠ মুড়ি ছুড়ে দেয় মেয়েটি।

কী, আরও মুড়ি খাবি ?

দেও। আমার পেট ভরা খিদা।

আর আমার অহন খিদা নাই। নে বাকি মুড়ি বেবাক তুই খাইয়া ফালা।

শেষ গুড়টুকু মুখে দিল কিশোরী, একমুঠ মুড়ি মুখে দিল তারপর মুড়ির গামলাটাই ছুড়ে ফেলে দিল নেড়ির সামনে। গামলা উপুড় হয়ে মুড়ি ছিটকে পড়ল মাটির ঘরটির সামনের ছোট্ট আঙিনায়। নেড়ি কোনোদিকে না তাকিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল মুড়ির ওপর। কিশোরী সেদিকে ফিরেও তাকাল না। উসকো খুসকো চুলভর্তি মাথা দুহাতে খচর মচর করে খানিক চুলকালো, তারপর ঘরে গিয়ে ঢুকল।

ঘরে শক্তপোক্ত ভারী ধরনের পুরনো একটা চৌকি। চৌকিতে শুয়ে গভীর ঘুম ঘুমাচ্ছেন দাদি। বুড়িটার অবস্থা এমন, ফাঁক পেলেই চৌকিতে শুয়ে একটু ঘুমিয়ে নেয়। একটানা অনেকক্ষণ কাজ করল, বাগানবাড়ির এদিক ওদিক গেল, তারপর ঘরে এসে চৌকিতে একটু কাত হলো, সঙ্গে সঙ্গে ঘুম। ঘুমালে আবার ভোস ভোস করে একটু শব্দও হয়।

এখনও হচ্ছে।

মাঝারি সাইজের মোটা শরীর দাদির। মাথার চুল সাদা-কালোয় মিশানো। তবে এই বয়সেও চুল বেশ ঘন, বেশ লম্বা। সেই লম্বা চুল এখন তেল চিটচিটে বালিশ থেকে নেমে চৌকি আর মেঝের মাঝ বরাবর ঝুলছে।

দৃশ্যটা দেখেই কিশোরী খানিক কী ভাবল। তারপর পা টিপে টিপে চৌকির কাছটায় এসে দাদির চুল যেখানে ঝুলছে সেই বরাবর বসল। বসে চুলগুলো চৌকির পায়ার সঙ্গে গিঁট দিয়ে দিল। যেমন নিঃশব্দে কাজটা সারল তেমন নিঃশব্দে ঘর থেকে তারপর বেরুল কিশোরী।

মুড়ি খাওয়া ততক্ষণে শেষ করে ফেলেছে নেড়ি। উপুড় হয়ে পড়ে থাকা গামলাটার সামনে তখনও ছোক ছোক করছে।

কিশোরী তাকে একটা ধমক দিল। কী রে সই, খাওয়া শেষ হওনের পরও এমুন করতাছস ক্যান ? তোর পেট কি ভরে না ? খিদা কি শেষ হয় না ?

সই মুখ তুলে কিশোরীর দিকে তাকাল। হইছে, সবই হইছে। পেট ভরছে, খিদাও শেষ হইছে।

তয় এমুন করতাছস ক্যান ?

এইটা আমগ স্বভাব। কুত্তার স্বভাব। পেট ভরা থাকলেও খাওন দেখলে একটু ছোক ছোক করবো, গন্ধ নেওনের চেষ্টা করবো।

বারান্দায় হাত আড়াই লম্বা একটা কঞ্চি পড়ে আছে। কঞ্চিটা হাতে নিল কিশোরী। দেখে সই একটা দৌড় দিল। খানিক দূরে গিয়ে বলল, মারবা নাকি ?

আরে না। সইরে সইয়ে মারে নি ? তোর যেমন ছোক ছোক করনের স্বভাব আমার তেমুন কঞ্চি হাতে লইয়া হাঁটনের স্বভাব।

তয় ঠিক আছে।

ল আমার লগে।

কোনদিকে যাইবা ?

গেটের দিকে যামু। আমি তো এই বাড়ির বাইরে কোনোদিন যাই না। আমার দুনিয়া বলতে এই বাগানবাড়ি। আপনা মানুষ বলতে ওই বুড়ি। আমার দাদি।

আরেকজন আছে, তয় তারে আমি বহুতদিন দেখি না। তার জইন্য আমার মনটা বহুত কান্দে রে, সই।

কিশোরী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

কুকুরটা কী বুঝল কে জানে, কিশোরীর পিছু পিছু হাঁটতে লাগল।

ভূতে চুল ধইরা টানে

একপাশে একাসিয়া গাছের বাগান আরেকদিকে পুকুর। রাস্তাটা তার মাঝখান দিয়ে সোজা চলে গেছে গেট বরাবর। বাগানের দিকটা দিনেরবেলাও অন্ধকারাচ্ছন্ন, পুকুরটা সবসময়ই আলোকিত।

মন্টু মিয়া প্লাস্টিকের হাতলঅলা একখানা চেয়ার নিয়ে মাঝে মাঝে এখানটায় এসে বসে থাকে। বিশাল লোহার গেট ভিতর থেকে তালাবন্ধ। বাগানবাড়ির মালিক সিরাজ সাহেব এলে, তার গাড়ির শব্দ পেলেই পুরো গেট খোলা হয়। অন্যসময় গেট বন্ধ। শুধু গেটের চারভাগের একভাগ মাপের একটা অংশ খোলার ব্যবস্থা আছে। মন্টু মিয়া বাজারঘাটে গেলে বা ফিরলে ওই অংশটা খোলা হয়। তখন দাদি আর কিশোরী থাকে এদিকটায়। ছোট্ট গেটটুকু খোলা আর বন্ধের কাজটা করে।

একাসিয়া বাগানের ভেতর দিয়ে গেটের দিকে এল কিশোরী। দূর থেকে মন্টু মিয়াকে দেখা যাচ্ছিল চেয়ারে বসে আছে, এখন দেখা গেল সে আসলে শুয়ে আছে। পা দুটো সামনের দিকে টানটান, মাথাটা চেয়ারে হেলানো আর হাত দুটো হাতলের দুদিকে ঝুলছে।

মন্টু মিয়ার স্বভাব হচ্ছে কোনো কোনোদিন সকালবেলা উঠেই সে দারোয়ানি পোশাক পরে। পায়ে বুটজুতা, পরনে খাকি প্যান্ট শার্ট, মাথায় দারোয়ানি টুপি, হাতে মোটা পুলিশি লাঠি।

আজ তার সাজগোজ তেমন। এই সাজগোজ নিয়ে সে দারোয়ানের ডিউটি করছে গেটের সামনে বসে। তালাবন্ধ গেটের সামনে বসে এই ডিউটির কী অর্থ কে জানে।

মন্টুকে ঘুমাতে দেখেই দাদির কথা মনে পড়ল কিশোরীর। সকালবেলা বুড়িটাও আজ ঘুমাচ্ছে, মন্টু মিয়াও ঘুমাচ্ছে। এত ঘুমের কী হলো? ঘটনা কী?

সই আছে কিশোরীর পিছন পিছন। তার দিকে তাকিয়ে ফিসফিসে গলায় কিশোরী বলল, সই, তুই কইলাম আওয়াজ দিছ না। আমি একখান কাম করুম।

আইচ্ছা ঠিক আছে। করো। আমি অন্যদিকে যাই।

কুকুরটা সত্যি সত্যি অন্যদিকে চলে গেল।

মন্টু মিয়াকে কিশোরী ডাকে মন্টুমামা। সই চলে যাওয়ার পর নিঃশব্দে মন্টুমামার চেয়ারের পিছনে এসে দাঁড়াল কিশোরী। দারোয়ানি টুপির বাইরে, ঘাড়ের দিকে বেরিয়ে আছে মন্টুমামার চুল। সেই চুল ধরে ভালো রকম একটা টান দিল। দিয়েই চেয়ারের পিছনে বসে পড়ল।

মন্টু একটু বেকুবপ্রকৃতির।

চুলে টান খেয়ে আচমকা ঘুম ভাঙল তার। দিশেহারা গলায় বলল, কে? কে?

তারপর এদিক-ওদিক তাকাল। কই, কেউ না তো! তয় আমার চুল ধইরা টান দিল কে? স্বপ্নের মধ্যে চুলে টান খাইলামনি? দিনেরবেলা চেয়ারে বইসা ঘুমাইয়া গেলাম, আবার স্বপ্নও দেখলাম? বা বাবা বা। বিরাট ঘটনা। তয় আর জাইগা থাইকা লাভ কী? আবার ঘুমাইয়া যাই, আবার স্বপ্ন দেখি।

আগের ভঙ্গিতে আবার ঘুমিয়ে গেল মন্টু। দাদির মতো চাইলেই ঘুমাতে পারে সে। আঠাশ-উনত্রিশ বছর বয়সের লোকটা রোগা পটকা ধরনের। কথা বলে খ্যাক খ্যাক করে। তবে লোক খারাপ না।

মন্টুকে ঘুমিয়ে পড়তে দেখে চেয়ারের পিছনে বসে থেকেই তার চুলে আবার একটা টান দিল কিশোরী।

এবার প্রায় লাফিয়ে উঠল মন্টু। না, এইডা স্বপ্ন না তো! স্বপ্নে চুলে টান খাইলে ব্যথা পাইতাম না। এইবারকার টানে বিরাট ব্যথা পাইছি। তয় চুল ধইরা টান দিল কে? এইখানে তো আমি ছাড়া অন্য কেউ নাই।

মন্টু সোজা হয়ে বসল। স্বগত ভঙ্গিতে বলল, বিরাশি বিঘার উপরে বাগানবাড়ি। গাছগাছালিতে ভরা, পুকুর আর ঝোপঝাড়ে ভরা। চাইর বচ্ছর ধইরা এই বাড়িতে আমি কাজ করি, তেনাদের কাউরে কোনোদিন দেখি নাই। এই বাড়িতে তেনারা কেউ আছেন এমুন নমুনাও পাই নাই। তয় কি এতদিন বাদে তেনারা কেউ আসলেন। আইসা দিন দোপরে আমার চুল ধইরা দুইখান টান দিলেন? দিনে আইসা ভূতে কি মানুষের চুল ধইরা টানে?

চেয়ারের পিছনে বসা কিশোরী গলার আওয়াজ যতদূর সম্ভব মোটা করে বলল, হ রে মউন্টা, ভূতেই তোর চুল ধইরা টান দিছে।

মন্টু সত্যি সত্যি ভয় পেয়ে গেল। উঠে দাঁড়াল সে, দাঁড়িয়ে সত্যি সত্যি কাঁপতে লাগল। মুখটা শুকিয়ে মরা টাকিমাছের পেটের মতো ফ্যাকাশে হয়ে গেল। হায় হায়, দিনেরবেলা ভূত! সেই ভূতে আবার দেখি কথাও কয়! হায় হায়।

তারপরই কিশোরীকে দেখে ফেলল মন্টু। সঙ্গে সঙ্গে শরীরের কাঁপন বন্ধ হলো তার। মরা টাকিমাছের পেটের মতো ফ্যাকাশে মুখ সতেজ হলো। রাগে ক্রোধে দাঁতে দাঁত চাপল সে। ও আইচ্ছা। তয় আপনে?

ধরা খেয়ে উঠে দাঁড়াল কিশোরী। হাসিমুখে বলল, হ আমি। আমিই ভূত।

কে কইছে আপনে ভূত। আপনে তো ভূত না।

তয় আমি কী?

আপনে হইলেন পেত্নি। সেই পেত্নির আবার একখান নাম আছে।

কী নাম?

শাকচুন্নি।

বাহ্ সোন্দর নাম তো!

সঙ্গে সঙ্গে থাবা দিয়ে কিশোরীর উসকো খুসকো চুল ধরল মন্টু। আমার লগে বিতলামি। একটা চোপাড় দিয়া বত্রিশটা দাঁত ফালাইয়া দিমু।

কিশোরী ঝটকা মেরে চুল ছাড়িয়ে নিল। ইস দাঁত ফালাইয়া দিব।

সত্যই তোর দাঁত আমি ফালাইয়া দিমু।

কেমনে ফালাবি?

চোপাড় মাইরা।

চোপাড় জিনিসটা কী?

থাপ্পড়, চটকানা।

সেইটা তুই পারবি না।

ক্যান পারুম না?

আমার তো দাঁতই নাই।

কচ কী? তোর দেখি মুখভরা দাঁত।

না, আইজ দাঁত নাই। এই যে দেখ?

মুখ ভেংচে দাঁত বের করল কিশোরী। মুখে এক টুকরো রোদ আগে থেকেই পড়েছিল তার। দাঁত বের করার ফলে রোদ দাঁতেও পড়ল, সাদা পরিষ্কার দাঁত ঝকঝক করে উঠল।

কিশোরী বলল, এই যে দেখ আমার দাঁত নাই। ভালো কইরা দেখ। আছে?

এবার মন্টু মহাক্ষিপ্ত হলো। কী, তুই আমারে তুই কইরা কইতাছিস?

হ তুই কইরা কইতাছি।

তোর দাদি আমারে বাপ ডাকে আর তুই কচ তুই?

এই খবরদার, দাদি তুইলা কথা কবি না।

তয় কি তোর বাপ তুইলা কথা কমু?

কী, আমার বাপ তুইলা কথা কবি?

হ কমু।

কইয়া দেখ তো।

এই যে কইলাম...

কী কইলি, ক।

তোর বাপে একটা ভণ্ড।

কী?

হ। তোর বাপে ভণ্ড। তোর মায় মইরা যাওনের পর তোরে তোর দাদির কাছে থুইয়া পলাইয়া গেছে। তুই হইলি ভণ্ড বাপের মাইয়া।

সঙ্গে সঙ্গে কিশোরীর মাথায় যেন আগুন ধরে গেল। কী, আমি ভণ্ড বাপের মাইয়া ? আমার বাপরে তুই গাইল দেচ ?

হাতের কঞ্চি দিয়ে সপাং করে একটা বাড়ি লাগাল মন্টুর দারোয়ানি পোশাক পরা পিছন দিকটায়।

বাড়ি খেয়ে মন্টু তিড়িং করে একটা লাফ দিল। ব্যথা পাই তো! ওই কিশোরী...

কিশোরী আবার একটা বাড়ি দিল। আমি ভণ্ডবাপের মাইয়া ?

মন্টু দুটো লাফ দিয়ে পিছিয়ে গেল। মুখে ভয়ার্ত ভাব। হায় হায়, পাগল তো চেইতা গেছে। ওই কিশোরী, ওই...

অহন ওই কিশোরী, ওই।

দৌড়ে গিয়ে আবার মন্টুকে একটা বাড়ি দিল কিশোরী। আর কোনোদিন কবি আমি ভণ্ডবাপের মাইয়া ?

মন্টু দিশেহারা ভঙ্গিতে পুকুরের পুব পারের দিকে দৌড় দিল। হায় হায়, পাগলে তো আইজ আমারে পিডাইয়া মাইরা ফালাইবো। হায় হায়।

মন্টুর পিছু পিছু ওদিকটায় আর গেল না কিশোরী। রাগ বিরক্তিতে হাতের কঞ্চি ছুড়ে ফেলল। তারপর একহাতে খচখচ করে মাথা চুলকাতে লাগল।

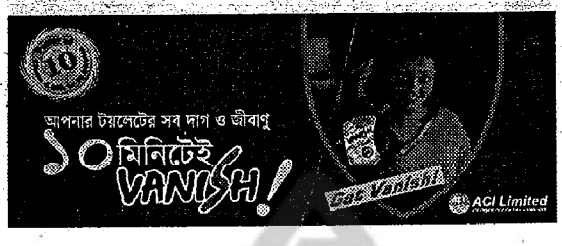

দাদির লগে মসকরা

ঘুম ভাঙার পর মাথাটা মাত্র তুলতে যাবেন দাদি, চুলে টান লাগল। একটু ব্যথাও পেলেন তিনি। তারপরই বুঝে গেলেন কাণ্ডটা কী হয়েছে এবং কে করেছে ?

শুয়ে থেকেই চৌকির পায়া থেকে চুলের গিঁট খুললেন দাদি। চৌকি থেকে নামলেন। মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে গেছে। মনে মনে বললেন, এই পাগলনিরে লইয়া আর পারি না। গাছের লগে কথা কয়, কাউয়া শালিকের লগে কথা কয়। কুত্তা বিলাইয়ের লগে কথা কয়। আর পাগলামির শেষ নাই। যা মনে হয় করে। আমার জানডা খাইয়া

ফালাইলো। এত যন্ত্রণা আর সইজ্য হয় না।

খুবই বিরক্ত মুখে ঘর থেকে বেরুলেন তিনি। বেরিয়ে মেজাজ আরও খারাপ হয়ে গেল। বারান্দার বাইরে একচিলতে উঠোন, উঠোনে পড়ে আছে কিশোরীর মুড়ি খাওয়ার গামলাটা।

গভীর বিরক্তিতে দুদিকে মাথা নাড়লেন দাদি। উঠোনে নেমে গামলাটা তুললেন।

দূর থেকেই দাদিকে দেখতে পেয়েছিল কিশোরী। দেখেই কদম গাছটার আড়ালে লুকিয়েছিল। এখন তাঁকে গামলা হাতে নিতে দেখে দৌড়ে এল। এই গামলা তুমি ধরলা ?

দাদি অবাক। ধরুম না ?

না না ধরবা না।

ক্যান ?

এইটা পচা গামলা।

গামলা আবার পচা হয় কেমনে ?

এইটাতে আমার সই মুখ দিছে।

তোর আবার সই কেডা ?

ওই যে ওই কুত্তাডা। ওইডার লগে আইজ বিয়ানে আমি সই পাতাইছি।

কুকুরটা বসে ছিল রান্নাচালার ওদিকে। দাদি আর কিশোরীকে দেখে এদিকটায় সে এলই না, যেমন বসে ছিল, বসে রইল।

অবাক হওয়ার ভাব ততক্ষণে উধাও হয়েছে দাদির মুখ থেকে। আগের রাগ বিরক্তি ফিরে এসেছে। চোয়াল শক্ত করে বললেন, কুত্তার লগে সই পাতাইছস ?

কিশোরী হাসল। হ। সই বহুত ভালো। মুড়ি খাইতে বইসা আমরা দুইজনে কত গল্প করলাম। আমি নিজে একবার আমি হই, আরেকবার হই কুত্তা। একমনে দুইজনে কথা কই। ভারি আমোদ লাগছে কথা কইতে। কুত্তা যখন মানুষের ভাষায় কথা কয় তখন যা আমোদ লাগে না! ও দাদি, তুমি যখন আমার দাদি, তখন তো আমার সইয়েরও দাদি! সইরে ডাকি, তুমি তার লগে একটু কথা কও।

তোর পাগলামি আইজ বাড়ছে, না ?

কিয়ের পাগলামি বাড়ছে ? আমি তো সবসময়ই এমুন।

হ সবসময়ই পাগল। তয় আইজ একটু বেশি। পাগলামি না বাড়লে কুত্তার লগে কেউ সই পাতায় না।

কিশোরী আচমকা খিলখিল করে হাসতে লাগল। এমন হাসি, পেট চেপে ধরে প্রায় উবু হয়ে পড়ে।

দাদি বললেন, এই থাম, থাম।

কিশোরী হাসতে হাসতে বলল, না থামুন না। আমার হাসতে ইচ্ছা করতাছে। ওই দেখো রান্ধনঘরের সামনে বইসা আমার সইয়েও হাসতাছে। কুত্তার হাসি কেমুন, সইয়ের দিকে তাকাও। তাকাইলে বুঝতে পারবা।

দেখ কিশোরী, আমি কইলাম তোরে অহন চটকানা মারুম। হাসি থামা।

না থামামু না।

চট করে কিশোরীর ডানগালে একটা চড় মারলেন দাদি। সঙ্গে সঙ্গে হাসি থেমে গেল কিশোরীর। খানিক দাদির দিকে তাকিয়ে মারমুখো ভঙ্গিতে তেড়ে গেল সে। ওই বুড়ি, ওই কুটনি বুড়ি, বান্দরনি বুড়ি। আমারে চটকানা মারছ ক্যান ? চটকানা মার নিজের গালে। আমি পাগল না, পাগল হইলি তুই। চকির পায়ার লগে আইজ তোর চুল বাইন্দা রাখছি, এরপর তোর চুল দিমু কাইট্টা। চুল কাইট্টা তোরে নাইড়া কইরা দিমু। তারবাদে তোর নাইড়া মাথায় আলকাতরা মাখাইয়া দিমু কুটনি বুড়ি, বান্দরনি বুড়ি।

হনহন করে হেঁটে কদম গাছটার দিকে এগিয়ে গেল কিশোরী। গাছটার কাছে পুরোপুরি গেল না, খানিকদূর গিয়েই ফিরে এল। তারপর আবার সেই খিলখিল হাসি।

দাদি মহাবিরক্ত হয়ে বললেন, ইস, আইজ তো বদ্ধপাগল হইয়া গেছে।

কিশোরী একথার ধার দিয়েও গেল না। হাসতে হাসতে বলল, ওই বুড়ি, আইচ্ছা তোমারে যদি সত্যই নাইড়া কইরা দেই, তারপর যদি সত্যই তোমার মাথায় আলকাতরা মাখাইয়া দেই, তয় তোমারে কেমুন দেখা যাইবো ?

কেমুন দেখা যাইবো ওইডা তোরে দেখাইতাছি। খাড়া।

কিশোরীর চুল মুঠি করে ধরার জন্য তেড়ে এলেন দাদি। দাদিকে ওভাবে তেড়ে আসতে দেখে আগের মতোই হাসতে হাসতে কদমতলার দিকে দৌড় দিল কিশোরী।

ধাউর মন্টু

চাচি, চাচি।

কিশোরীদের উঠোনে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে দাদিকে ডাকলো মন্টু। কিশোরীর দাদিকে সে চাচি ডাকে।

দাদি ঘরেই ছিলেন। হাতের কাজটাজ শেষ করে আবার একটু শোবেন ভাবছেন, এসময় মন্টুর ডাক।

দাদি শোয়ার পরিকল্পনা বাদ দিলেন। দরজার দিকে পা বাড়ালেন।

মন্টু আবার ডাকল। চাচি, ও চাচি। তাড়াতাড়ি বাইর হও, তাড়াতাড়ি।

মাঝারি ধরনের মোটা শরীর যতদূর সম্ভব টেনে দ্রুত বারান্দায় বেরিয়ে এলেন দাদি। কী রে বাজান ? এমুন চিল্লাইতাছস ক্যান ? কী হইছে ?

মন্টু মহাবিরক্ত। মুখটা ছাগলের মুখের মতো লম্বা করে রেখেছে। বলল, আবার জিগাও কী হইছে ?

হ জিগাই। কী হইছে ক ? ঘটনা কী ?

ঘটনা আর কী! তোমার নাতিন।

ঘটনা যে আমার নাতিনে সেইটা তোর আওয়াজ শুইনাই বুজছি।

কী বুজছো কও তো ?

আরে সেইটা আমি কেমনে কমু ? কিশোরী কী করছে ক আমারে। শুনি।

আমারে পিটাইছে।

কী ? কী করছে ?

তুমি কি কানে কম শোনো ? বয়রা হইয়া গেছো ?

আরে না। কান আমার ঠিকই আছে। কানে ঠিক মতনই শুনি।

তয় শোনলা না ক্যান ?

কী শুনি নাই ?

এই জন্যই তো কইলাম, তুমি বয়রা হইয়া গেছো।

আচ্ছা এত প্যাচালের কাম নাই। ঘটনা ক।

কিশোরী আমারে পিটাইছে।

সত্যই পিটাইছে ?

তয় কি মিছা পিটাইছে ? আমি তোমারে মিছাকথা কইতাছি ?

আরে না, তুই মিছাকথা কবি ক্যান ?

হ এইটা হইল আসল কথা। আমি মিছাকথা কই না। কোনোদিনও কই না। কিশোরী আমারে সত্যই পিটাইছে।

কী দিয়া পিটাইছে রে, বাজান ?

কঞ্চি দিয়া। ওর হাতে সবসময় একখান কঞ্চি থাকে না, ওই কঞ্চি দিয়া পিটাইছে।

দেখি, দেখি।

এই যে দেখো, এই যে। কঞ্চি দিয়া মনের সুখে পিটাইছে। কমপক্ষে বিশ তিরিশটা পিটানি দিছে। পিটাইয়া আমার পুরা শরিল লাল কইরা ফালাইছে। দারোয়ানি ডেরেস খুইলা তোমারে দেখামু ?

না বাজান দেখানের কাম নাই। আমি বুজছি।

তয় শরিলের খোলা জায়গায় বাড়ি লাগে নাই। লাগলে তোমারে দেখাইতে পারতাম কেমুন লাল আমার শরিল হইছে।

হায় হায় কয় কী ?

হ। চাচি, আইজ আমি বহুত চেতছি।

দাদি হায় আফশোসের গলায় বললেন, চেতনের তো কথাই বাজান।

মন্টু এবার অন্য লাইনে কথা বলল। আমার মালিক আমার কথায় তোমগ দাদি আর নাতিনরে এই বাড়িতে আশ্রয় দিছে। কথা ঠিক ?

কথা ঠিক না। তবু দাদি বললেন, হ বাজান।

মাসে মাসে খোরাকি টেকাও দেয়। কী দেয় না ?

দেয় বাজান, দেয়।

কী জইন্য দেয় ? দেয় খালি আমার খাতিরে। কী, কথা ঠিক ?

হ বাজান।

মালিকে অনেকবার তোমগ বিদায় কইরা দিতে চাইছে, আমি হাতে পায়ে ধইরা তারে কইছি, না স্যার, এই কাজটা কইরেন না। আপনে এত বড়লোক মানুষ। দুইজন মানুষরে খাওয়াইয়া পরাইয়া বাঁচাইয়া রাখলে আল্লাহয় আপনেরে বরকত দিব। বাগানবাড়ির পিছন দিককার যেই মাটির ঘরটা আছে ওইটা তো স্যার খালিই পইড়া থাকে। দুইজন মানুষ থাকলে বাড়ি পাহারার কাজটাও হইল, ওরাও বাঁচল। স্যারে আমার কথার দাম দিছে। তোমগ থাকন খাওনের কোনো অসুবিধা নাই। শাকসবজি তরিতরকারি বাগানবাড়ি থিকাই খাও। স্যারের পুকুরের মাছ নিজের জইন্য ধরি আমি, সেখান থিকা তোমগ দুইজনরে ভাগ কইরা দেই। এত কিছুর পর তোমার নাতিনে আমারে পিটায় ? পিটাইয়া লাল কইরা দেয় ? আমি স্যারের কাছে বিচার দিমু।

না বাজান, না। তার কাছে বিচার দিছ না।

তুমি যতই কও, আমি তোমার কথা আর শুনুম না। তোমার নাতিনে যদি এইভাবে আমারে পিটাইয়া লাল করে তয় কইলাম তোমগ আমি এই বাড়ি থিকা বিদায় কইরা ছাড়ুম।

দাদি এগিয়ে এসে মন্টুর মাথায় পিঠে হাত বুলাতে লাগলেন। না বাজান না, তুই এত চেতিছ না। কিশোরী হইল পাগল।

মন্টু আগের মতোই তেজালো গলায় বলল, সেইটা আমি জানি।

আইজ ওর পাগলামিটা একটু বাইড়া গেছে বাজান। আমার চুল বাইন্দা থুইছে চকির পায়ার লগে। মুড়ির গামলা ফালায় দিছে উঠানে। ওই যে কই থিকা একটা নেড়িকুত্তা আহে, ওইটার লগে সই পাতাইছে। কুত্তায় বলে ওর লগে কথা কয়।

হ হ বোজলাম তোমার কথা। পাগলামি যখন বাইরা গেছে তখন ঘর থিকা বাইর হইতে দিছো ক্যান ?

তয় কী করুম ?

শিকল দিয়া বাইন্দা থোও।

সেইটা করতে মায়া লাগে বাজান।

বারান্দার মাটিতে বসে পড়ল মন্টু। অযথাই ব্যথা বেদনার একটা শব্দ করল। ইসসি রে, শরিলের বেদনায় মইরা যাইতাছি। এমুন পিটান মানুষরে মানুষে পিটায় ? তুমি যাই কও চাচি, তোমার কথা আমি শুনুম না। স্যাররে আইজই আমি ফোন করুম। বেবাক ঘটনা কমু। হয় তোমরা এই বাড়িতে থাকবা নাইলে আমি থাকুম। পাগলনির হাতের মাইর আমি আর খামু না।

এগিয়ে এসে মন্টুর মাথায় পিঠে আবার হাত বুলিয়ে দিলেন দাদি। এই কাম তুই করিছ না বাজান। স্যাররে ফোন করিছ না। এইসব কথা কইছ না। আমি কিশোরীরে শাসন করুম নে।

কী শাসন করবা ?

কী যে করুম সেইটা জানি না বাজান। তয় ওরে আমি সামলামু। ও তোর লগে আর কোনোদিনও এমুন করব না।

ও আরেকখান কথা, কিশোরী তো আমারে আইজ একবারও মন্টুমামা কয় নাই। তুমি কইরা কয় নাই। কইছে মউন্টা আর তুই।

কইলাম না ওর পাগলামি আইজ বাড়ছে।

ইসসি রে, শইল্লের বেদনায় মইরা গেলাম। তয় চাচি, তোমার খাতিরে, খালি তোমার খাতিরে আইজ আমি...

তারপর কী বলবে খুঁজে পেল না মন্টু। বলল, ধুরো, কী কমু হেইডাও তো ভুইলা যাইতাছি। এই রকম পিটানি আরেকদিন খাইলে বাপের নামও ভুইলা যামু। আইজ খালি মাথাটা ফট্টি নাইন হইছে।

একটু থামল মন্টু। তারপর আচমকা বলল, এককাপ চা খাওয়াও চাচি।

বয় বাজান বয়। অহনই খাওয়াইতাছি।

তয় চায়ে আদা দিও। লবঙ্গ এলাচি দারচিনিও দিও। ওই চা খাইলে শরিলের বেদনা কমবো।

দাদি ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বললেন, আইচ্ছা, দিতাছি বাজান।

দাদি নাতনির আলাপ-আলোচনা

ঘরের ভিতর অল্প পাওয়ারের একটা বাল্ব জ্বলছে।

সেই আলোয় শোয়ার আগের টুকটাক কাজ করছে দাদি। কিশোরী বিছানায় শুয়ে শিশুর মতো পা নাচাচ্ছে। হঠাৎ দাদিকে ডাকল। বুড়ি, ওই বুড়ি।

কিশোরীর এই ডাকে অভ্যস্ত দাদি। বললেন, কী ?

আমার পা টিপা দেও।

কী করুম ?

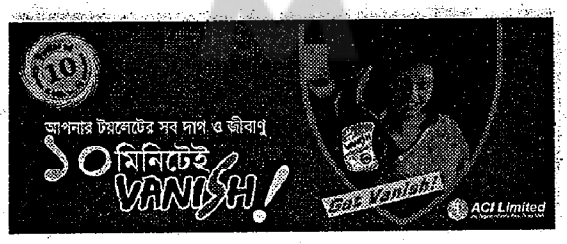

পা টিপা দেও।

আবার ক। শুনি নাই।

তুমি বয়রা হইয়া গেছো ? কানে শোনো না ?

না শুনি না।

জোরে কমু ?

ক।

কিশোরী চিৎকার করে বলল, আমার পা টিপা দেও।

ক্যান, ক্যান পাও টিপা দিমু ?

পাও বেদনা করতাছে।

দাদি বিরক্ত হলেন। দেখ কিশোরী, তুই কইলাম আইজ মাইর খাইবি। বেদম মাইর খাইবি।

ক্যান মাইর খামু ?

তুই আইজ অনেক ঘটনা ঘটাইছস।

কী কী ঘটাইছি ?

মুড়ির গামলা ফালাইয়া দিছস, মন্টুরে মারছস।

হ দুইটাই সত্য।

তারপরও তোরে আমি কিছু কই নাই।

কী কইবা ?

হাতের কাজ শেষ করে মুখে একটুকরা পান দিলেন দাদি। পান চিবাতে চিবাতে বললেন, কমু অর্থ হইল সত্যই আমি তোরে মাইর দিমু।

আমারে মাইর দিলে আমিও তোমারে মাইর দিমু।

কচ কী ?

হ।

আমারে তুই মাইর দিবি ?

হ দিমু।

অসহায় চোখে কিশোরীর দিকে খানিক তাকিয়ে রইলেন দাদি, তারপর চৌকিতে কিশোরীর পাশে বসলেন। কাতর অসহায় গলায় বললেন, তুই যদি সব সময় এমুন পাগলামি করছ, তয় তোরে ফালাইয়া আমি চইলা যামু।

কই চইলা যাইবা ?

যেই দিকে দুই চক্ষু যায়।

আইচ্ছা যাও গিয়া। তুমি চইলা গেলে আমার মজা।

কেমুন মজা ?

আমি একলা একলা থাকুম। নিজে ভাত তরকারি রাইন্ধা খামু। যখন যেই দিকে ইচ্ছা যামু গিয়া। কেউ আমারে কিছু কইবো না। যখন খারাপ লাগবো সইয়ের লগে গল্প করুম। দাদি গো, সইয়ের লগে গল্প করতে বিরাট মজা।

চুপ কর।

দাদি একটু থামলেন। তারপর বললেন, সত্যই আমি তোরে থুইয়া একদিন চইলা যামু। তোর মায় মরণের পর, তুই যখন খুব

ছোট, তোরে ফালাইয়া তোর বাপে যেমুন চইলা গেছে, আমিও ওমনে চইলা যামু।

হঠাৎ করেই ছোট্ট শিশুর মতো দাদির কোলে মুখ গুঁজে দিল কিশোরী। বলল, না না আমি তোমারে মারুম না। কোনোদিনও মারুম না। তুমি আমারে ফালাইয়া যাইয়ো না দাদি। তুমি চইলা গেলে আমি কার কাছে থাকুম ?

এই না কইলি একলা একলা থাকবি ? একলা একলা ভাত রাইন্ধা খাবি, কুত্তার লগে সই পাতাইছস তার লগে গল্প করবি।

ধুরো, ওইগুলি মিছা কথা।

চট করেই বিছানায় উঠে বসল কিশোরী। দাদি ও দাদি।

কী ?

তুমি যে খালি কও, আমার বাপে একদিন ফিরত আইবো। আইসা আমারে বহুত আদর করবো।

হ আইবো তো।

কবে আইবো দাদি ? কও না কবে আইবো ?

তুই ভালো না হইলে আইবো না।

তোমারে খবর পাঠাইছে ?

হ।

তয় কেমনে ভালো হইতে হয় আমারে তুমি শিখাইয়া দেও।

শিখাইলে তুই ভালো হবি ?

হমু তো।

সত্য ?

সত্য। তুমি এখন শিখাইয়া দেও, আমি এখনই ভালো হইয়া যাই। দেও শিখাইয়া দেও। তাড়াতাড়ি শিখাইয়া দেও।

এক নম্বর হইল মন্টুরে আর মারবি না।

আইচ্ছা মারুম না।

দুই নম্বর হইল মুড়ির গামলা, ভাতের থালা এইসব আর ফেলবি না।

আইচ্ছা ফেলুম না। তয় কুত্তার লগে সই পাতান যাইবো ?

না যাইবো না।

তয় ঠিক আছে যাইবো না। কাইলই সইর লগে আড়ি লইয়া লমু। আর কথা কমু না। তোমারে পাও টিপতেও কমু না।

ঠিক ?

ঠিক, একদম ঠিক।

হ এইগুলি না করলেই তুই ভালো হইয়া যাইবি।

তখন আমার বাপে ফিরত আইবো?

হ।

জানবো কেমনে আমি ভালো হইয়া গেছি?

খবর দেওন লাগবো।

কেমনে খবর দিবা? ফোন করবা?

হ।

দাদি লাইট অফ করে শুয়ে পড়লেন। অহন ঘুমা বইন। আর প্যাচাইল পারিছ না।

দাদির পাশে শুয়ে কিশোরী বলল, আইচ্ছা ঘুমাইতাছি।

তারপর একটু থেমে বলল, ও দাদি, আমার পাও দুইডা একটু টিপা দেও।

দাদি গম্ভীর গলায় বললেন, কী করুম?

না না, মাথাডায় একটু আদর কইরা দেও। তুমি মাথায় আদর করলে আমি লগে লগে ঘুমাইয়া যাই।

অন্ধকার ঘরে পাগল নাতনীর মাথায় গভীর মমতায় হাত বুলাতে লাগলেন দাদি। দেখতে দেখতে শিশুর ভঙ্গিতে মুখে আঙুল দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল কিশোরী।

মন্টুর দুই নম্বরী

সিরাজ সাহেবের ফোন এলে মন্টু একেবারে পাগল হয়ে যায়।

খুবই সস্তা ধরনের একটা মোবাইল সেট তাকে কিনে দিয়েছেন সিরাজ সাহেব। মাসিক বাজেট তিনশো টাকা। প্রতিদিন দশটাকা হিসেবে খরচা করতে পারবে সে।

মন্টু সেটা করে না। ওই তিনশো টাকা থেকেও পয়সা বাঁচায়। যেটুকু পয়সা বাঁচে বেতনের সঙ্গে সেটা মিলিয়ে ঝিলিয়ে নিজে এখানে চলে। ফরিদপুরের গ্রামে বউ ছেলেমেয়ে আছে তাদেরকে পাঠায়।

এখানে অবশ্য মন্টুর খরচ খুবই কম। থাকা ফ্রি। খাওয়াও বলতে গেলে ফ্রিই। বাগানবাড়িতে শাকসবজি ফলে প্রচুর। পুকুরে মাছ চাষ করা হয়, সেই মাছ থেকে প্রতিদিন বড়শি ফেলে দুচারটা বাচ্চা পাঙাস ধরে। এমন কী ভাত রান্নার চালটাও তার লাগে না। চাল সংগ্রহের অন্য ব্যবস্থা আছে। বাগানবাড়ির পুবপাশে বাইশ বিঘা ধানের জমি আছে সিরাজ সাহেবের। সেই জমি বর্গা দেওয়া। প্রচুর ধান হয়। ধান সিরাজ সাহেব নেন না, টাকার বিনিময়ে বর্গা দেন। দুই সিজনে নির্ধারিত টাকা।

ওই বর্গাদারের সঙ্গে ভালো একটা লাইন আছে মন্টুর। সে একটা কমিশন পায়। কমিশন হিসাবে ক্যাশ টাকাটা সে নেয় না। মাসের চালটা গোপনে নিয়ে আসে। সিরাজ সাহেব টের পান না।

কিশোরী এসব বোঝে না। দাদি কিছুটা বোঝেন। ঘটনাটাও জানেন। তবে মন্টুকে তিনি ঘাঁটান না। ধানের সিজনে দাদিকেও দশ বিশ কেজি চাল ম্যানেজ করে দেয় মন্টু। সাক্ষীকে হাতে রাখা ভালো।

মন্টু এখন মোবাইল ফোনে খুবই জি স্যার, জি স্যার করছে।

সে পায়চারি করছে তার ঘরের সামনের উঠোনে। ঘরটা লম্বা মতন, চারদিকে ইটের দেয়াল, মাথার ওপর ইট রংয়ের টালির ছাদ। সামনে চওড়া বারান্দা। বারান্দাটা গ্রিল দেওয়া। বারান্দায় ঢোকার জন্যও রডের একটা দরজা। ভিতর থেকে সেই দরজা তালা দিয়ে রাখা যায়।

দূর থেকে মন্টুকে খেয়াল করে দেখছিল কিশোরী। কথা শুনে আর আচরণ দেখে বোঝা যাচ্ছে কার সঙ্গে কথা বলছে মন্টু।

বাগানবাড়ির মালিক সিরাজ সাহেবের সঙ্গে।

স্যারের সঙ্গে কথা বলার সময় মন্টু কখনও বসে থাকতে পারে না। দাঁড়িয়ে এমন বিনীত ভঙ্গিতে কথা বলে, যেন স্যার ওর সামনে দাঁড়িয়ে আছেন।

এখনও তেমনই অবস্থা। জি স্যার, জি। সব ঠিক আছে স্যার। একদম ঠিক আছে। না না, কোনো সমস্যা নাই। আপনে নিশ্চিন্তে বিদেশে যান স্যার। আমি আছি না? জান দিওয়া দিমু তাও বাড়ির একখান পাতায় কেউরে হাত দিতে দিমু না।

মন্টু একটু থামল। খানিক জি স্যার, জি স্যার করল। তারপর কেলানো ভঙ্গিতে বলল, কোন দেশে যাইবেন স্যার?

ওপাশে সিরাজ সাহেব বোধহয় বিরক্ত হলেন। বোধহয় একটা ধমকও দিলেন মন্টুকে। মন্টু একটু থতমত খেল। মুখটা চুন হয়ে গেল। এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখতে চাইল তার চুন হওয়া মুখ কেউ দেখতে পেল কী না!

তখনও কিশোরীকে সে দেখে নি। কিশোরী দাঁড়িয়ে আছে আমগাছগুলোর ওদিকটায়। ওখান থেকে মন্টুর কথা সবই শুনতে পাচ্ছে, মন্টুকে দেখতেও পাচ্ছে পরিষ্কার কিন্তু মন্টু তাকে দেখতে পাচ্ছে না।

ধমক খেয়ে চুন মুখ নিয়ে কোনোরকমে মন্টু বলল, না না স্যার, ঠিক আছে স্যার। আপনের যেই দেশে ইচ্ছা যান স্যার। কোনো অসুবিধা নাই। জি স্যার। স্লামালায়কুম স্যার।

ফোন বন্ধ করে স্বগত ভঙ্গিতে বলল, বেশি মাতাব্বরি কইরা ধমকটা খাইলাম। সে মালিক মানুষ, ধমক তো দিবোই।

ফোন পকেটে রেখে ঘরের দিকে যাবে মন্টু, কিশোরী এসে সামনে দাঁড়াল। অতি আদুরে আহ্লাদী গলায় ডাকল, মন্টুমামা, ও মন্টুমামা।

স্যারের কাছে ধমক খাওয়ার ঝালটা কিশোরীর ওপর তুলতে চাইলো মন্টু। খেকুড়ে গলায় বলল, ইস, মন্টুমামা।

মামায় কইছে খালাতো ভাই।

আল্লাদের আর সীমা নাই।

কথাটার অর্থ কী, মন্টুমামা? কোন মামায় কারে খালাতো ভাই কইছে?

এই তুই যা এখান থিকা।

কিশোরীর সেই আগের মতোই আহ্লাদী ভঙ্গি। না যামু না।

ক্যান যাবি না?

ক্যান যামু? তুমি আমার মামা না?

না আমি তোর মামা না। আমি তোর কেউ না।

না তুমি আমার মামা। আমার মন্টুমামা। মন্টুমামা, ও মন্টুমামা...

দেখ কিশোরী...

কী দেখুম?

আমার মিজাজ খারাপ করবি না।

আমি তোমার মিজাজ খারাপ করতাছি না। আমি আদর কইরা তোমারে মামা ডাকতাছি।

আদরের কাম নাই।

আছে। আদর বহুত ভালো জিনিস।

মন্টু চোখ কটমটিয়ে কিশোরীর দিকে তাকাল। এইমাত্র সাহেবের একখান ধমক খাইছি। সেই ধমক কইলাম তোরে দিমু।

ধমক খাইছো ক্যান?

সেইটা শোননের কাম নাই। তুই যা।

না আমি যামু না।

তয় কইলাম বিরাট ধমক দিমু।

দেও, ধমক দেও।

মন্টু অবাক। কচ কী? ধমক দিমু?

কইলাম তো দেও। তাও আমার কামডা কইরা দেও।

ও এই মতলব?

হ। দেও ধমক দেও। দরকার হইলে দুইটা চটকানা মাইরা দেও। তাও কামডা কইরা দেও।

মন্টু ভুরু কুঁচকে বলল, কী কাম?

কিশোরী উচ্ছল গলায় বলল, আমি তো ভালো হইয়া গেছি...

কিশোরীর কথা শেষ হওয়ার আগেই মন্টু অবাক গলায় বলল, কী? কী কইলি? আবার ক তো?

আমি ভালো হইয়া গেছি। আমার মাথায় অহন আর ছিট নাই।

আইচ্ছা। তারবাদে?

দাদি কইছে, ভালো হইলে আমার বাপে ফিরত আইবো।

মন্টু তার স্বভাবসুলভ ফাজিল গলায় বলল, তয় কথা হইল তুই ভালো হইয়া গেছচ। তোর মাথায় অহন আর ছিট নাই।

হ। ছিট নাই। আমি পুরা ভালো হইয়া গেছি। তুমি বোজতাছো না আমি ভালো হইয়া গেছি।

না বুজতাছি না।

ওই দেখো মন্টুমামায় কয় কী ? ভালো না হইলে তোমার লগে আমি এত কথা কইতাম ? এত ভালো ভালো কথা কইতাম ? কইতাম না। তোমারে দিতাম পিটানি।

এই কথায় মন্টু একটু ক্ষিপ্ত হলো। ইস পিটানি দিত ?

কাইল দিলাম না ?

হ দিছস।

তয় ?

কাইল তোরে কিছু কই নাই। আইজ পিটাইতে আইলে মাইর খাবি।

কিশোরী মন্টুর কাছে এগিয়ে এল। আইচ্ছা দেও, মাইর দেও।

কী করুম ?

মাইর দেও আমারে। তাও আমার কামটা কইরা দেও।

ভুরু কুঁচকে সন্দেহের চোখে কিশোরীর দিকে তাকাল মন্টু। কী কাম ?

কাম খারাপ না। ভালো কাম।

ক সেইটা ?

একটা ফোন কইরা দেও।

ফোন কইরা দিমু ? কারে ?

আমার বাপরে।

তোর বাপরে ফোন করুম ? আমার মোবাইল থিকা ?

হ। তোমার মোবাইল থিকা।

কী কইতে হইব তারে ?

কইবা আমি ভালো হইয়া গেছি। সে যেন ফিরত আসে। তার জইন্য আমার মনটা খুব কান্দে। তারে দেখনের জন্য বুকটা ফাইটা যায়। বাপের মুখ কেমুন, আমি তো দেখি নাই। আমি তারে দেখতে চাই মন্টুমামা। চোখ ভইরা দেখতে চাই। সারা দিন সারা রাইত বাপের লগে থাকতে চাই।

কথা বলার সময় কিশোরীর চোখ দুটো কেমন ছলছল করে উঠল। কিশোরী মেয়েটির বুকের অনেক ভিতর থেকে কী রকম একটা দুঃখ বেদনার সুর উঠে এল।

মন্টু বলল, নম্বর আছে, নম্বর ?

কিসের নম্বর ?

তোর বাপের ফোন নম্বর ?

শুনে কিশোরী স্নিগ্ধ মুখ করে হাসল। ওই দেখো মামায় কয় কী ? তোমার ফোন ভরা দেখি নম্বর। নম্বরের আকাল আছেনি ? ওই নম্বর থিকা করো।

মন্টু ভাবল এই যন্ত্রণার হাত থেকে বাঁচতে হলে ফোন একটা কোথাও তাকে করতে হবে অথবা ফোন করার ভান করে, মিছিমিছি কিছু কথা বলে পাগলকে ঠান্ডা করতে হবে।

সঙ্গে সঙ্গে পথটা বের করে ফেলল মন্টু। হাসিমুখে বলল, আরে হ, আমিই ভুইলা গেছিলাম। আমার ফোন ভরা ম্যালা নম্বর। দুনিয়ার বেবাক বাপের নম্বর আমার ফোনে। তোর বাপের নম্বরও আছে। খাড়া নম্বর বাইর করতাছি। খাড়া তুই।

হ খাড়াইছি মামা।

ফোনে অযথাই টিপাটিপি করতে লাগল মন্টু।

কিশোরী উদগ্রীব গলায় বলল, পাইছো ?

আরে খাড়া, পাইয়া যামু। এই তো পাইছি, এই তো পাইছি।

তয় করো মামা, তাড়াতাড়ি বাবারে ফোন করো।

করতাছি, তয় আমার একখান কথা আছে।

কী কথা ?

তুই কোনো আওয়াজ দিতে পারবি না।

আইচ্ছা আওয়াজ দিমু না।

তুই তোর বাপের লগে কথা কইতে পারবি না।

ক্যান ?

কইলে সমস্যা আছে।

কী সমস্যা ?

এত প্যাচাইল পারিছ না। সব সমস্যা তুই বুজবি না।

তয় কথা কইবো কে ?

আমি কমু।

কী কইবা ?

কমু, তোমার মাইয়া বাপ বাপ কইরা পাগল হইয়া গেল। তুমি তার কাছে ফিরত আসো।

আইচ্ছা ঠিক আছে। কও।

বাটন টিপে ফোন অফ করল মন্টু। তারপর বন্ধ ফোনের বাটন টিপে টিপে এমন একটা ভঙ্গি করল যেন সত্যি সত্যি সে কিশোরীর বাবার নাম্বারে ফোন করছে। বাটন পুশ করা শেষ করে এমনভাবে ফোন কানে লাগাল, যেন সত্যি সত্যি ফোনে কাউকে ধরছে সে।

তারপর বেশ একটা ভাব নিয়ে কথা বলতে লাগল। হ্যালো, হ্যালো। আপনে কি রতন মিয়া? কিশোরীর বাপ ? জি জি বুজছি। আমি হইলাম সিরাজ স্যারের বাগানবাড়ির কেয়ারটেকার মন্টু। আপনের নামের মতন আমার নামের লগেও মিয়া আছে। মন্টু মিয়া। জি জি। ফোন করছি কী জইন্য ? আরে ভাই আপনের মাইয়ার জইন্য। আপনের মাইয়ায় আমারে মামা ডাকে। সেই অর্থে আপনে আমার দুলাভাই। শোনেন দুলাভাই, আপনের মাইয়া ভালো হইয়া গেছে। একদম ভালো হইয়া গেছে। ওর মাথায় অহন আর একটুও ছিট নাই। সত্যকথা, হ একদম সত্যকথা। আরে রিস্তায় আমি হইলাম আপনের শালা। শালায় কি দুলাভাইর লগে কোনোদিন বিতলামি করে ? আরে হ দুলাভাই, কিশোরী পাগলনি পুরা ভালো হইয়া গেছে। ওর মাথা আগে আছিল ফট্টি নাইন, অহন হইছে খালি নাইন। আপনে অহন আইসা পড়তে পারেন, মাইয়ার কাছে আইসা পড়তে পারেন। তাড়াতাড়ি আইসা পড়েন। দেরি কইরেন না। ঠিকানা হইল ভালুকা থানার হবিরবাড়ি ইউনিয়ন। গ্রামের নামও হবিরবাড়ি। সিরাজ সাবের বাগানবাড়ি বললে পথের ফকিরেও আপনেরে বাড়ি চিনাইয়া দিব। আইসা পড়েন, আইজই আইসা পড়েন। আইচ্ছা দুলাভাই, রাখলাম।

ফোন বন্ধ করার ভান করে কিশোরীর দিকে তাকাল মন্টু। যেন বিশাল একটা কাজ করেছে এমন ভঙ্গিতে কিশোরীর দিকে তাকালো। দিছি তোর বাপেরে ফোন কইরা। মনে হয় আইজই আইসা পড়বো। যা অহন ভাগ।

কিশোরী উচ্ছ্বসিত গলায় বলল, ভাগতাছি মামা, ভাগতাছি।

বলেই আচমকা মন্টুকে একটা ধাক্কা দিল কিশোরী। মন্টু প্রায় চিৎপটাং হয়ে যাচ্ছিল। কোনোরকমে নিজেকে সামলাল। কিশোরী খিলখিল করে হাসতে হাসতে দৌড় দিল।

মন্টু মহা বিরক্তির গলায় বলল, এই বান্দরনিডারে পাগলা গারদে দেওন উচিত। ওর জায়গা হইল পাবনা, হেমায়েতপুর।

কিশোরীর কানে সেকথা গেল না। একদৌড়ে সে চলে এসেছে তাদের ঘরের সামনে। মুখটা আনন্দে ফেটে পড়ছে। মাত্র চিৎকার করে দাদিকে ডাকতে যাবে, তার আগেই ব্যস্তভঙ্গিতে ঘর থেকে বেরুলেন দাদি। রান্নাঘরের দিকে যাবেন, কিশোরী লাফ দিয়ে তাঁর সামনে এসে দাঁড়াল। দাদি, ও দাদি, কারবার তো হইয়া গেছে।

দাদি ভুরু কুঁচকে কিশোরীর দিকে তাকালেন। কী হইছে ?

মন্টুমামায় বাবারে ফোন কইরা দিছে।

কী করছে ?

বাবারে ফোন করছে, ফোন। আমার সামনে খাড়াইয়াই করছে।

এ্যাঁ ?

হ। বাবায় আইসা পড়বো।

দাদি যা বোঝার বুঝলেন। তাচ্ছিল্যের গলায় বললেন, হ বুজছি।

তারপর রান্নাঘরের দিকে পা বাড়ালেন।

কিশোরী থাবা দিয়ে তাঁর শাড়ির আঁচল ধরল। ওই বুড়ি, কী বুজছো ?

দাদি বিরক্ত হলেন। এই ছেমড়ি, ছাড়। আমার কাম আছে। রান্ধন চড়াইতে হইব।

খুশি হইলা না ?

হ হইছি। বহুত খুশি হইছি।

সত্যই খুশি হইছো ?

হ। তুই অহন যা।

দাদি রান্নাচালার দিকে চলে গেলেন। তাঁর আচরণে খুশি হলো না কিশোরী। পিছন থেকে মুখ ভেংচালো দাদিকে। তুই একটা ফাজিল বুড়ি, বান্দরনি বুড়ি। তোর কথা আমি শুনুম না। সইয়ের লগে আড়ি লইছিলাম, অহন সেই আড়ি ভাইঙা ফালামু। নেড়ির লগে আবার সই পাতামু। আবার খাতির করুম, গল্প করুম। ওই যে কদমতলায় বইসা রইছে আমার সইয়ে। যাই তার লগে গল্প করি গিয়া।

নেড়ি কুকুরটা কদমের ছায়ায় উদাস হয়ে বসে আছে। দ্রুত হেঁটে তার সামনে এল কিশোরী। তোর লগে আমার আড়ি নাই সই।

সত্যই ?

হ। আড়ি ভাইঙা ফালাইলাম।

বহুত ভালো করছো। আমি বহুত খুশি হইলাম। তয় আড়িটা লইছিলা কবে ?

মনে মনে লইছিলাম। তোরে কই নাই।

ও আইচ্ছা।

ল অহন দুই সইয়ে বইসা বইসা গল্প করি। আসো করি।

কদম গাছটির চারপাশে ঘন সবুজ ঘাস। জায়গাটা খুব সুন্দর। গাছের গোড়ার দিকটাও পরিষ্কার। কিশোরী কদমগাছে হেলান দিয়ে বসল। আমি তোরে অহন আমার বাবার কথা কমু সই। শুনবি ?

শুনুম না মানি ? অবশ্যই শুনুম। তুমি কও।

তুই আমারে তুমি তুমি কইরা কইতাছস ক্যান ? আমি তোরে কই তুই, তুই দেখি কছ তুমি ? এক সই আরেক সইরে তুমি কয় ?

ঠিক আছে, তুই কইরাই কইতাছি। ক সই ক, তোর বাপের কথা ক।

আমার বাপরে আমি বহুত ভালোবাসি, বহুত আদর করি।

কেমনে ভালোবাসোছ, কেমনে আদর করছ? তার লগে তোর তো দেখাই হয় না।

তাও ভালোবাসি, তাও আদর করি। সব মনে মনে। বাবার জইন্য আমার মনডা খুব পোড়ে। খুব কান্দন আসে।

সে তোর কাছে আসে না ক্যান ?

কইতে পারি না সই। দাদির মুখে শুনছি, আমগ বাড়ি আছিল পদ্মানদীর পারে। বড়বাড়ি আছিল। সোন্দর সোন্দর ঘর দুয়ার আছিল। পদ্মানদীতে ভাইঙা গেছে সেই বাড়ি ঘর। আমি তখন মাত্র হইছি। এই এত্তটুকু। ওঁয়া ওঁয়া করি। আমার মায় গেল মইরা। মায় মরণের পর আমারে দাদির কাছে থুইয়া বাবায় কই জানি চইলা গেল। আর কোনোদিন ফিরত আইলো না। বাবারে আমি আর কোনোদিন দেখলামই না। দাদি আমারে বুকে লইয়া দেশগ্রামের এই বাড়ি ওই বাড়ি কাজ কইরা খাইছে। এই বাড়ির যে মালিক, সিরাজ সাব, সিরাজ সাব হইল আমগ গ্রামের মানুষ। সে তো ধনীমানুষ। দাদি তারে হাতেপায়ে ধইরা কইল, আপনে আমারে আর আমার নাতিনটারে বাঁচান। দুনিয়াতে আমগ কেউ নাই। ছেলেটা কই চইলা গেছে, জানি না। মার খবরও লয় না, মাইয়ার খবরও লয় না। তারবাদে সিরাজ সাবে দাদিরে আর আমারে এই বাড়িতে থাকতে দিছে।

তয় যে তোর মন্টুমামায় কয় সে তগো দুইজনরে থাকতে দিছে। সিরাজ সাবরে কইয়া তগো থাকন খাওনের ব্যবস্থা করছে ?

মিছাকথা। মউন্টা হইল ধাউর। খালি মিছাকথা কয়। এর লেইগাই তো ওরে মাঝে মাঝে আমি পিটানি দেই।

তোর দাদি দেখি মউন্টা যা কয় তাই শোনে। সে মিছাকথা কয় আর তোর দাদি সেইটাই মাইন্যা লয়।

এইটা দাদি ইচ্ছা কইরা করে। এক বাড়িতে তিনজন মানুষ থাকি, ঝগড়াঝাটির কাম কী ? সিরাজ সাবে মিলাঝিলা থাকতে কইছে। আমরা মিলাঝিলা থাকি। তয় আমার মিজাজ খারাপ হইলে আমি মউন্টারে মাইর দেই।

হ সেইটা তো জানিই।

আর একখান কথা আছে।

কী কথা ?

মউন্টা ধাউর আর মিথ্যুক। তয় আমারে বহুত ডরায়। আমার কথাও শোনে। আইজ আমার কথায় বাবারে ফোন করছে। বাবায় এই বাড়িতে আসবো।

তুই তো তোর বাপরে কোনোদিন দেখছ নাই...

না না দেখছি। অনেক ছোটকালে। ছয়সাত মাস বয়স হইব আমার তখন।

বাপের চেহারা মনে আছে ?

আরে না। ওই বয়সে দেখা চেহারা মনে থাকে নি ?

তয় বাপে আইলে তুই তারে চিনবি কেমনে ?

মনে হয় চিনুম। চেহারা দেখলেই চিনুম। আমি তার কথা এত চিন্তা করি, এত স্বপ্ন দেখি তারে, মনে মনে এত কথা কই তার লগে, আর তারে দেখলে আমি চিনুম না ? অবশ্যই চিনুম।

তোরে একখান কথা জিগাই সই ?

জিগা।

যেই বাপে তোরে ফালাইয়া চইলা গেছে, তুই এতবড় হইয়া গেছস তাও তোরে দেখতে কোনোদিন আসে নাই, তোর কোনো খবর লয় নাই, সেই বাপের জইন্য তোর এত মায়া কেন ? এত ভালো সেই বাপরে তুই ক্যান বাসছ ?

এইটা আমি তোরে কইতে পারুম না সই। যেই মায় আমারে জন্ম দিছে সেই মার কথা আমার একবারও মনে হয় না। মনে হয় খালি বাবার কথা। দিনরাইত চব্বিশটা ঘণ্টা বাবার কথা আমার মনে হয়। আমি কতদিন বাগানবাড়ির এদিক-ওদিক ঘুইরা বেড়াই আর মনে মনে বাবারে ডাকি। ও বাবা, তুমি কই চইলা গেছো ? তুমি আসো না ক্যান ? আইসা আমার কাছে থাকো। আমারে আদর করো, আমারে একটু কোলে নাও। দুই হাতে আমি তোমার গলাটা একটু জড়ায়া ধরি। সারা দিন তোমার লগে লগে থাকি। তোমারে বাবা বাবা কইরা ডাকি।

আমার মনে হয় মায় মইরা গেছে দেইখা তার কথা তোর মনে হয় না সই। বাপ বাইচা আছে দেইখা তার কথা মনে হয়। তারে লইয়া তুই এত চিন্তা করছ ?

হইতে পারে। তয় এইবার আমার বাবায় আমার কাছে আইবো। মন্টুমামায় ফোন কইরা দিছে।

বাবায় আইলে তুই কী করবি, সই ?

বাবারে আর ছাড়ুম না। আমার কাছে রাইখা দিমু। বাবায় আমি আর দাদি তিনজন বহুত আনন্দে থাকুম। আমারে তো সবাই পাগলনি কয়, বাবায় আইলে সেইটা আর কইবো না। বাবারে দেখলেই আমার মাথার ছিট ভালো হইয়া যাইবো। ইস, আমার যে আইজ কী ভালো লাগতাছে সই, বইলা তোরে বুঝাইতে পারুম না। মনডা ছটফট ছটফট করতাছে। কখন যে বাবায় আসবো ?

চৈত্রমাসের দুপুরবেলার রোদে বাগানবাড়ির গাছপালা ঝকমক ঝকমক করছে। থেকে থেকে চৈতালি হাওয়া আসে ধানীমাঠের ওদিক থেকে। বাগানবাড়ির গাছপালা আলোড়িত হয়। কত ফুলের সুবাস বাতাসে। এদিক-ওদিক কত পাখি ডাকে। এই মনোরম পরিবেশে পাগল মেয়েটি কদম গাছে হেলান দিয়ে বসে থাকে। বাবার জন্য অপেক্ষা করে। এই অপেক্ষার কষ্ট তার সই নেড়িকুকুরটা বুঝতে পারে না। ঈশ্বর সবাইকে সব ক্ষমতা দেন নি।

মতির আগমন

আকাশে আজ কুমড়ার ফালির মতো চাঁদ।

তাও বেশ সরু ফালির চাঁদ। অর্থাৎ চাঁদের বয়স তিন-চারদিনের বেশি হয় নি। সামান্য একটু জ্যোৎস্না হয়েছে এই চাঁদে। বাগানবাড়ির চারপাশের মাঠে জ্যোৎস্না পড়েছে। বাগানবাড়ির গাছপালায় পড়েছে ঠিকই, ঘন গাছপালার কারণে তলার দিকে পড়তে পারে নি। ফলে আবছা একটা অন্ধকার চারদিকে।

সন্ধ্যার দিকে এই এলাকায় এসেছে মতি। পরনে খয়েরি রংয়ের অতি পুরনো টেটরনের প্যান্ট আর সাদা ফুলশার্ট। এখন চৈত্রমাস। এসময় শীতের নামগন্ধও নেই। বরং ভালো রকমের গরম পড়তে শুরু করেছে। তবু মতির সঙ্গে একটা লাল সবুজের মিশেল দেওয়া মাফলার। সেই মাফলার গামছার মতো করে সে কোমরে বেঁধে রেখেছে।

বড় রাস্তার ওদিকে বাস থেকে নেমেছিল। জায়গাটার নাম তখনও জানে না। নামার পর বাজার মতো জায়গাটার দোকানপাটের সাইনবোর্ডে দেখে জায়গার নাম 'সিডস্টোর'। বাসস্ট্যান্ডের পশ্চিম দিকে একটা রাস্তা ঢুকে গেছে। কোথায়, কোন ঠিকানায় গেছে সেই রাস্তা কে জানে। তখন মাফলারটা কাঁধে ফেলা ছিল। বাসে বসেও সে মুখটা রেখেছিল এমন করে যেন যাত্রীরা কেউ পরিষ্কার দেখতে না পায় তার মুখ। মুখ আড়াল করবার জন্য মাফলারে মুখ ঢেকে ঘুমের ভান করেও বসেছিল সে। যেন অতিক্লান্ত একযাত্রী। বহুদূর পথ পাড়ি দিয়ে এসেছে। গভীর ক্লান্তিতে বসে বসেই ঘুমিয়ে গেছে।

কোথায় যাবে কোনো গন্তব্য নেই। এসেছে শেরপুরের ওদিক থেকে। সিডস্টোর বাজারে বাস থামতেই নেমে পড়েছে। নামার সময় বেশ একটু অভিনয়ও করেছে। অযথাই খুক খুক করে কাঁশছিল, যেন খুবই কাশি হচ্ছে তার, খুবই ঠান্ডা লেগেছে। মাফলারে এমনভাবে মুখ মাথা ঢেকেছিল, কেউ তাকে চিনতেই পারবে না।

তবু বাজারের আলোকিত জায়গাটা সে দ্রুত পেরিয়ে এসেছিল। পশ্চিম দিককার গ্রামের রাস্তায় ঢুকে তবে স্বস্তি।

তারপর থেকে হাঁটছে আর হাঁটছে।

বাজারের ওদিক থেকে মাইল দেড় দুই হেঁটে আসার পর ডানদিকে ঢুকে গেছে আরেকটা রাস্তা। গাছপালায় ঘেরা রাস্তার দুপাশে কোথাও কোথাও শুধুই গাছপালার বন, খোলামাঠ, মানুষের ঘরবাড়িও আছে আর আছে শস্যের মাঠ। চাঁদের মৃদু আলো অন্ধকার তেমন দূর করতে পারে নি। মতির সঙ্গে ছোট্ট একটা টর্চ আছে, মোবাইল আছে। মোবাইলেও আলো হয়। কিন্তু দুটো জিনিসের কোনোটাই সে ব্যবহার করছিল না। ওই পথে হনহন করে হাঁটছিল।

বেশ খানিকটা রাত হওয়ার পর বাগানবাড়িটার এদিকটায় সে এসেছে। এসে দেখে চারদিকে শস্যের মাঠ, দূরে দূরে গ্রাম আর পথের ধারে দেয়াল ঘেরা বিশাল এক বাড়ি। বাড়ি ডুবে আছে ঘোরতর অন্ধকারে। ততক্ষণে ক্ষীণ চাঁদ ডুবে গেছে।

এই বাড়িতেই ঢুকতে চাইল মতি।

বিশাল লোহার গেট বন্ধ। দেয়ালও বেশ উঁচু। এদিক দিয়ে দেয়াল টপকে ঢোকা যাবে না। তবে বিশাল বাড়ি। চারদিকটা ঘুরে দেখলে নিশ্চয় ঢোকার কোনো না কোনো পথ পাওয়া যাবে।

অন্ধকারে চোরের মতো ধানীমাঠে নেমে বিশাল বাড়িটার চারদিকটা ঘুরে দেখতে চাইল মতি। তখন টর্চলাইটটা তাকে ব্যবহার করতে হচ্ছিল। তবে খুবই সাবধানে কাজটা সে করছিল। রাস্তার দিক থেকে বা মাঠের ওপারকার গ্রামের বাড়িঘর থেকে কেউ টর্চের আলো দেখে যেন কিছু বুঝতে না পারে। তবে পুরোটা ঘুরতে হলো না, তার আগেই বুঝে গেল পুরো বাড়ি গেটের দিককার মতো উঁচু দেয়াল দিয়ে ঘেরা না। কোনো কোনোদিকে কাঁটাতারের বেড়াও আছে। দশ-বারো ফুট লম্বা পিলার দিয়ে, কাঁটাতার বসানো হয়েছে পিলারের সঙ্গে। সেই কাজটাও করা হয়েছে বেশ ভালোভাবে। ঘন কাঁটাতার সরিয়ে বাড়িতে ঢোকা সত্যি কঠিন।

তবু পথ একটা বের করল মতি।

পুরো বাড়ির বাইরের দিকটা ঘোরার আগেই একটা জায়গায় দেখতে পেল কাঁটাতারের নিচের দিকে উঁচু মাটি খানিকটা খসে পড়ে গর্তমতো হয়েছে। শেয়াল-কুকুর অনায়াসে এই পথে যাতায়াত করতে পারে।

বাগানবাড়িতে ঢোকার জন্য এই পথটাই বেছে নিল মতি। শেয়ালের মতো গুড়ি মেরে অতিকষ্টে বাগানবাড়ির ভিতর সে ঢুকে গেল। কাঁটাতারের খোচাখাচি খেলো পিঠে, বাহুতে। ওসব তেমন গায়ে লাগল না।

বাড়িতে ঢুকে দেখে এদিক-ওদিক টিমটিমে দুচারটা আলো আছে। দূরে দূরে অল্প পাওয়ারের বাল্ব জ্বলছে। পল্লীবিদ্যুৎ ভালোই সার্ভিস দিচ্ছে।

রাত তেমন হয় নি। তবু বাড়িটা একেবারেই নিঝুম। সবচে' সুন্দর বাংলো মতন ঘরটার সামনে আলো জ্বলছে। দূরে কেয়ারটেকার বা দারোয়ান টাইপের লোকজনদের জন্য একটা ঘর। সেই ঘরের সামনেও একটা লাইট। বাড়িটা উত্তর-দক্ষিণে। দক্ষিণ দিকে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। বেশ অন্ধকার। পশ্চিম দিকটায় লম্বা মতন পরিত্যক্ত ধরনের একটা টিনের ঘর। ওই ঘরটার সামনেও একটা লাইট জ্বলছে।

কোথাও কোনো প্রাণের সাড়া নেই। মানুষজন নিশ্চয় সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে।

মতি একটা স্বস্তির হাঁপ ছাড়ল। এই বাড়ির কোথাও কয়েকটা দিন যদি লুকিয়ে থাকা যায়! এতবড় বাড়ি, নিশ্চয় লোকজনের চোখ ফাঁকি দিয়ে থাকা যাবে। সমস্যা হবে শুধু একটাই, খাওয়াদাওয়া। এই যেমন এখনই খিদায় পেট চো চো করছে। সারাদিন খাওয়া হয় নি কিছুই। পকেটে টাকাপয়সা আছে সামান্যই। বাসভাড়া দেওয়ার পর সেই সামান্য টাকা এসে দাঁড়িয়েছে প্রায় শূন্যের কোঠায়। ওইটুকু খরচা করে খাওয়ার সাহস হয় নি। একেবারে নিঃস্ব হয়ে গেলে বিপদ। খাওয়ার জন্য পয়সা খরচা করা যাবে না। চুরি করে হোক বা এদিক-ওদিক করে হোক, যেভাবেই হোক খাবার জোগাড় করতে হবে। পয়সা পকেটে যেটুকু আছে ওখান থেকে একটি পয়সাও খরচা করা যাবে না। কখন কোথায় কী লেগে যায় কে জানে! যদি অন্যকোথাও যেতে হয়, বাস ট্রেনের ভাড়া লাগলে, লঞ্চের ভাড়া লাগলে কোথায় পাবে!

হ্যাঁ দুটো সম্পদ তার আছে। একটা মোবাইল আর একটা ওই টর্চ। টর্চটা খুবই অল্প দামি, ওই জিনিস বিক্রি করলে আর কয় টাকা পাওয়া যাবে! মোবাইলটা বিক্রি করলে দুআড়াই হাজার টাকা পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু ওটা বিক্রি করলে নিজের পরিচিত সার্কেল, নিজের জগৎ সব জায়গা থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে হবে। ভালোমন্দ খোঁজখবর কিছুই সে পাবে না। সামনে তাহলে পুরোটাই অন্ধকার। আলোর চিহ্নই থাকবে না।

না না মোবাইল বিক্রি করা যাবে না।

নিঃশব্দে হেঁটে হেঁটে পুরো বাড়িটা দেখল মতি। অন্ধকারে চোরের মতো এদিক-ওদিক গেল। সবদিক ঘুরে এলো লম্বা মতন ভাঙাচোরা টিনের ঘরটার ওদিকে। এদিকটায় আলো জ্বলছে ঠিকই কিন্তু ঘরটার কোনো ছিরিছাদ নেই। চারদিকে টিনের বেড়া, মাথার ওপর সামনের দিকে কাত হওয়া টিনের চালা। অর্থাৎ ঘরটা মজবুত না, নড়বড়ে। পুরনো জোড়াতালি দেওয়া কাঠের কোনোরকম একটা দরজা আছে। দেখেই বোঝা যায় দরজাটা বন্ধ না, ভিড়ানো। ভিতরে লোকজন থাকে বলে মনে হয় না।

আলতো করে দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকল মতি। ঢুকেই ভ্যাপসা একটা গন্ধ পেল। পুরনো ভাঙাচোরা নানা প্রকারের পরিত্যক্ত জিনিসপত্র দিনের পর দিন কোনো একটা ঘরে ডাঁই করে রাখলে যে রকম গন্ধ হয়, গন্ধটা তেমন।

মতি এবার টর্চ জ্বালল। ঘরের ভিতর এদিক ওদিক টর্চের আলো ফেলতে লাগল।

যা ভেবেছিল তাই। এটা ওরকমই একটা ঘর। বাড়ির যত ভাঙাচোরা পুরনো অব্যবহৃত জিনিসপত্র আছে সব ডাঁই করা এই ঘরে। ভাঙা চেয়ার টেবিল, কাঠ রড, ইট বালু হার্ডবোর্ড লোহা লক্কড় তো আছেই, একপাশে একগাদা খড়নাড়া। একটা ইঁদুর প্রায় পায়ের ওপর দিয়ে দৌড়ে গেল মতির।

মতি বুঝে গেল এই ঘরে সহজে কেউ ঢোকে না। খড়নাড়ার গাদার পেছনটায় ইচ্ছে করলেই সে লুকিয়ে থাকতে পারবে। খড়নাড়ার বিছানায় ঘুমাতেও পারবে।

কিন্তু খিদায় যে পেট জ্বলে যাচ্ছে এই যন্ত্রণা মিটাবে কীভাবে?

বাড়িতে যেহেতু লোকজন থাকে, রান্নাঘর নিশ্চয় আছে। রান্নাঘরে খুঁজলে কিছু না কিছু পাওয়া যেতে পারে। আগে পেটে কিছু দিয়ে তারপর এই ঘরে এসে ঢুকবে মতি। পেটে কিছু পড়লে, খিদাটা একটুও যদি মিটে তাহলে খড়ের গাদা থেকে কিছু খড় পিছন দিকটায় নিয়ে বিছানা মতো করে শুয়ে পড়লেই শরীর ভেঙে ঘুম আসবে। এত ক্লান্ত শরীর, শুয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই আর খবর থাকবে না।

কয়েকদিন ধরেই মতির চালচলন বিড়ালের মতো। এত নিঃশব্দে চলাফেরা করতে শিখে গেছে সে, খুব কাছ দিয়ে হেঁটে গেলেও মানুষ তার পায়ের শব্দ পাবে না।

এরকম নিঃশব্দেই পরিত্যক্ত ঘরটি থেকে বেরুলো মতি। মন্টু যে ঘরটায় থাকে ওদিকটায় চলে এল। মন্টুর ঘরের পিছন দিকটায় রান্নাঘর। বাগানবাড়িতে নানা রকমের কাজ হয় প্রায়ই। ঝোঁপঝাড় পরিষ্কার, পুকুরে মাছ ছাড়া, মাছ ধরা। দশ-বিশজন লোক কাজ করে তখন। তাদের খাওয়াদাওয়ার জন্য, রান্নাবান্নার জন্য মন্টুর ঘরের পাশে বেশ বড়সড় একটা রান্নাঘর করা হয়েছে। হাঁড়িপাতিল, চালডাল তরিতরকারি সব থাকে সেই ঘরে।

মতি সেই ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল।

এদিকটা আলোকিত। মন্টুর ঘরের সামনে অল্প পাওয়ারের বাল্ব সারা রাত জ্বলে। সেই আলো ঘরের পিছন দিকটায়ও একটু এসেছে।

কিন্তু রান্নাঘরের দরজায় বিশাল তালা।

তালা দেখেই বুক কাঁপিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল মতির। আলতো করে তালাটা একটু নেড়ে দেখল সে। না এই তালা ভাঙার সাধ্য তার নেই। এই তালা ভাঙতে গেলে খবর হয়ে যাবে। আর সে তো চোর না। তালা ভাঙবে কেন?

মতি তারপর কিশোরীদের ঘরের ওদিকটায় এল।

এদিকটায় আলো নেই। মতি যে ঘরটায় থাকবে সেই ঘরের ওদিককার অল্প পাওয়ারের বাল্বের কিছুটা আলো এসেছে। তাতে রান্নাচালাটা আবছা মতন দেখা যায়। মতি সেদিকটায় চলে এল। রান্নাচালায় ঢুকে মাটির হাঁড়িকুড়ি ঘাঁটাঘাঁটি করতে লাগল। খিদেয় এখন বলতে গেলে তার আর হুস নেই। টিনের একটা গামলা সরাতে গিয়ে ভালো রকম একটা শব্দ হলো। সঙ্গে সঙ্গে ঘরের ভিতর থেকে দাদি সাড়া দিলেন। কেডা রে, কেডা?

মতি আর দাঁড়িয়ে থাকার সাহস পেল না। নিঃশব্দ পায়ে দৌড়ে চলে গেল পরিত্যক্ত ঘরটার দিকে।

চোরের আওয়াজ পাওয়া যায়

রান্নাঘরের ওইটুকু শব্দেই ঘুম ভেঙেছে দাদির।

আজ বোধহয় ঘুম তেমন গভীর হয় নি তাঁর। শব্দের সঙ্গে সঙ্গেই সাড়া দিয়েছেন। কেডা, কেডারে? বাইরে তারপর আর কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া যায় নি। দাদির সন্দেহ হলো, চোর এল নাকি?

উঠলেন তিনি। উঠে লাইট জ্বাললেন। আলোয় ভরে গেল ঘর। কিশোরী ছিল গভীর ঘুমে। চোখে আলো লাগতেই ঘুম ভাঙল। চোখ ডলতে ডলতে উঠে বসল সে। কী হইছে, দাদি?

ঘরের মেঝেতে চিন্তিত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছেন দাদি। বললেন, কিসের জানি শব্দ পাইলাম।

কোনদিকে পাইলা শব্দ?

রান্ধনঘরের দিকে।

শিয়াল আইছে। আর নাইলে আমার সইয়ে।

আমার মনে হয় না।

তয় তোমার কী মনে হয় ?

সেইটাই চিন্তা করতাছি।

চলো দুয়ার খুইলা দেইখা আসি।

না।

ক্যান ?

চোর আইসা থাকলে অসুবিধা আছে।

কী অসুবিধা ?

হাতে ছুরি থাকতে পারে।

সর্বনাশ। ছুরি দিয়া আমগ কাইটা ফালাইবো ?

কাটতে পারে।

তয় বাইর হওনের কাম নাই। মন্টুমামারে ডাকো।

এখন তো আর শব্দ পাইতাছি না। ডাইকা লাভ কী ?

তয় শুইয়া পড়ো।

মেঝেতে নেমে দাদির পাশে দাঁড়াল কিশোরী। দাদির কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বলল, আমার মনে হয় চোরের শব্দ না দাদি।

তয় কিসের শব্দ ?

ওই যে 'তারা' আছে না ? তাগো শব্দ।

কথাটা বুঝতে পারলেন না দাদি। বললেন, তারা আবার কারা ?

আরে ওই যে তারা। রাইত বিরাইত যাগো নাম নেওন যায় না। বুজঝো ?

না বুঝি নাই।

আরে বুড়ি ভূতের, ভূতের শব্দ।

কিশোরীকে একটা ধমক দিলেন দাদি। ওই তুই চুপ কর।

কিশোরী একটা হাই তুলল। আইচ্ছা চুপ করলাম। তুমি জাইগা থাকো, আমি ঘুমাই।

বিছানায় উঠে কুকরে মুকরে শুয়ে পড়ল কিশোরী। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমিয়ে পড়ল।

সকালবেলা এসব কথা আর মনেও নেই কিশোরীর। খানিক আগে ঘুম থেকে উঠে রান্নাঘরে গেছে সে। চুলা থেকে একমুঠ ছাই নিয়ে অনেকক্ষণ ধরে ঘষে ঘষে দাঁত মেজেছে। তারপর এলুমিনিয়ামের একটা জগে পানি নিয়ে মুখ ধুচ্ছে, গুড়মুড়ির গামলা নিয়ে দাদি এলেন। এই ছেমড়ি, ধর।

দাদির দিকে পানির জগ বাড়িয়ে দিল কিশোরী। আগে তুমি এইটা ধরো।

দাদি জগটা ধরলেন। কিশোরী সঙ্গে সঙ্গে দাদির শাড়ির আঁচল দিয়ে মুখ মুছল। তারপর গুড়মুড়ির গামলা হাতে নিল।

দাদি বললেন, খবরদার, আইজ যদি মুড়ি খাইয়া আবার গামলা ফালাইয়া দেছ, তয় কইলাম খবর আছে।

একমুঠ মুড়ি মুখে দিল কিশোরী। এক কামড় গুড় মুখে দিল, ওই দেখো দাদি কয় কী ? গামলা ফালামু ক্যান ? আমি কি পাগল ? ফালাইতে হইলে মুড়ি ফালাইয়া দিমু নে।

না, কিচ্ছু ফালাবি না।

হায় হায়, বুড়ি কয় কী ? মুড়ি না ফালাইলে আমার সইয়ে খাইবো কী ? ওই যে দেখো আমার সইয়ে আইসা পড়ছে।

না ওইসব সইমই আমি বুঝি না। মুড়ির দাম আছে। এই মুড়ি কুত্তারে খাওয়ানোর লেইগা ভাজি নাই।

ওরে তুমি কুত্তা কইয়ো না দাদি। ও আমার সই।

যা ইচ্ছা হোক গিয়া। মুড়ি ফালাবি না। ফালাইলে আমি মনে করুম তুই ভালো হছ নাই। আর ভালো না হইলে তোর বাপে কইলাম আইবো না।

বাবার কথা শুনে গভীর উৎসাহে চোখ দুটো চকচক করে উঠল কিশোরীর। মন্টুমামায় তোমারে কইছে ?

হ কইছে।

তয় ঠিক আছে, তয় আমি আর পাগলামি করুম না। আমি ভালো হইয়া গেলাম।

অদূরে দাঁড়িয়ে কুকুরটা মুখ তুলে তাকিয়ে আছে কিশোরীর দিকে আর লেজ নাড়াচ্ছে। কিশোরী তার দিকে তাকিয়ে বলল, সই, আমি অহন তোরে মুড়ি দিতে পারুম না। তুই অহন যা, ভাগ।

কুকুরটা কিছুই বুঝল না। সে তার মতো দাঁড়িয়ে লেজ নাড়াতে লাগল।

কিশোরী আর কুকুরটার দিকে তাকাল না। দাদির দিকে তাকিয়ে খুবই আন্তরিক গলায় জিজ্ঞেস করল, কাইল রাইতে কে আইছিল, দাদি ?

বুজলাম না।

চোর আইছিল নি ?

আইতে পারে।

নাকি শিয়াল ?

তাও হইতে পারে।

নাকি আমার সইয়ে রান্ধনঘরে গিয়ে খাওন দাওন খুঁজছে ?

মনে হয় না।

তয় কী মনে হয় তোমার ?

মনে হয় চোরই আইছিল।

চোরে তোমারে কামড় দিছে ?

এতক্ষণ ভালো কথা বলতে বলতে হঠাৎ একটু পাগলামি, দাদি বিরক্ত হলেন। চুপ কর, পাগলের গুষ্ঠি।

বারান্দা থেকে উঠানে নামলেন দাদি। আমি একটু মন্টুর লগে কথা কইয়া আসি। রাইতে শব্দটা পাইলাম। এই রকম শব্দ কোনোদিন পাই না। চোরের আসা যাওয়া শুরু হইলে বিপদ। দেখি মন্টু কী কয়।

কিশোরী কথা বলল না। তাকিয়ে তাকিয়ে দাদির চলে যাওয়া দেখল। তারপর দুতিন মুঠ মুড়ি নিয়ে উঠোনে ছড়িয়ে দিল। খা সই, খা। অহন দাদি নাই। তাড়াতাড়ি খাইয়া ফালা। দাদি আসনের আগেই শেষ কর।

মুড়ির গামলা হাতে পরিত্যক্ত ঘরটার দিকে হাঁটতে লাগল কিশোরী। একমুঠ মুড়ি মুখে দেয়, সঙ্গে এক কামড় গুড়। খচর মচর করে চিবায় আর হাঁটে।

সকালবেলার রোদে ভরে আছে বাগানবাড়ি। গাছে গাছে ওড়াউড়ি করছে পাখিরা, ডাকাডাকি করছে। কুকুরটাকে মুড়ি খেতে দেখে দুটো কাক আর একটা শালিক পাখি এসে নেমেছে মাটির ঘরটির সামনে। চারটি প্রাণীর যে যেদিক দিয়ে পারে মুড়ি কুড়িয়ে খাচ্ছে। একটু একটু হাওয়া বইছে। সেই হাওয়ায় ফুলের সুবাস। এই বাড়িতে কত রকমের যে ফুলের গাছ। বছরভর কোনো না কোনো ফুল ফুটেই থাকে।

পরিত্যক্ত ঘরটার দিকে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎই কিশোরী দেখে ঘরের দরজাটা একটু ফাঁক হয়েছিল, নিঃশব্দে সেই ফাঁকটুকু যেন বন্ধ হয়ে গেল। যেন ঘরের ভিতর থেকে দরজা ফাঁক করে কেউ কিছু দেখছিল, কিশোরীকে দেখেই দরজা টেনে দিয়েছে।

কিশোরীর একটু যেন সন্দেহ হলো।

এই ঘরে কেউ থাকে না। বাড়িতে তারা তিনজন মাত্র মানুষ। সে, দাদি আর মন্টুমামা। তাহলে এই ঘরে কে ?

কিশোরী কি ঠিক দেখল ? নাকি চোখের ভুল ?

ধীর পায়ে পরিত্যক্ত ঘরের দরজার সামনে এসে দাঁড়াল কিশোরী। হাতে মুড়ির গামলা কিন্তু মুড়ি মুখে দেওয়ার কথা আর মনে নেই তার।

বাইরে থেকে দরজাটা আস্তে করে ধাক্কা দিল কিশোরী। এই দরজা ভিতর থেকে বন্ধ করার ব্যবস্থা নেই, দরকারও নেই। এই ঘরে যা আছে ওসব জিনিস মাগনা দিলেও কেউ নেবে না।

ঘরে ঢুকে এদিক ওদিক তাকাতে লাগল কিশোরী। তারপর খড়নাড়ার স্তূপটার সামনে এসেই চমকে উঠল।

একটা লোক বসে ছিল, কিশোরীকে দেখেই উঠে দাঁড়িয়েছে। মুখটা ভাঙাচোরা, অসহায়। কিশোরীর চোখের দিকে এমন মায়া ভরা চোখে কয়েক পলক তাকিয়ে রইল, তারপর কাতর অনুনয়ের গলায় বলল, মা মাগো, মা, আমারে তুমি বাঁচাও মা। আমারে তুমি বাঁচাও।

লোকটার মুখের দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে রইল কিশোরী।

লোকটা বলল, দুইদিন ধইরা না খাইয়া রইছি মা। আমারে কিছু খাইতে দেও। আমারে তুমি বাঁচাও।

কিশোরী চিন্তিত গলায় বলল, আমারে মা কইতাছেন ?

হ মা হ। তুমি আমার মা।

আপনে কে ? আপনে আমার বাপ ?

বাপ নাগো মা, বাপ না। তয় তোমার বাপের মতন। আমারে কিছু খাইতে দেও মা।

কিশোরী সঙ্গে সঙ্গে কেঁদে ফেলল। বাপ হইয়া তুমি আমার লগে মিছাকথা কইতাছো ?

না মা না, আমি তোমার লগে মিছাকথা কই না।

মন্টুমামারে দিয়া আমি তোমারে ফোন করাইছি। সেই ফোন পাইয়া এইখানে আইছো তুমি। আইসা আমার লগে দেখা করো নাই। এই ঘরে পলাইয়া রইছো। তুমি কেমুন বাপ ?

কিশোরীর কথা শুনে মতি গেল হতভম্ব হয়ে। কোনোরকমে বলল, আমি তোমার কথা বুঝতে পারতাছি না মা।

একহাতে চোখ মুছল কিশোরী। তারপর সেই হাত দিয়েই মতির একটা হাত ধরল। আর বোঝনের কাম নাই। আসো আমার লগে।

মতি ছিটকে সরে গেল। না না, না।

ক্যান ? আসবা না ক্যান ?

আমি কোনোখানে যামু না। আমি এখানেই থাকি।

তুমি না বলে খিদায় মইরা যাইতাছো ?

হ মা হ। খিদায় মইরা যাইতাছি।

তয় আসো আমার লগে। ঘরে চলো, তোমারে খাইতে দেই।

না মা, আমি এখানেই থাকি। তুমি খালি আমারে কিছু খাওন আইনা দেও।

এইখানে বইসা খাইবা ক্যান ? এইটা একটা পচা নোংরা ঘর। ইন্দুরে ভরা।

তাও আমি এইখানেই থাকুম। এইখানে থাকতে আমার কোনো অসুবিধা নাই।

তয় থাকো।

আর একখান কথা মা...

কী ?

আমি যে এইখানে আছি এইডা তুমি কেউরে কইয়ো না।

ক্যান, কমু না ক্যান ?

আমার অসুবিধা আছে মা।

কিয়ের অসুবিধা ?

সেইটা তুমি বুঝবা না।

বুঝাইয়া কও।

পরে বুঝামুনে। তুমি তো আমারে বাপ ডাকছ, বাপের উপকারটা করো মা। পরে একদিন আমি তোমারে বেবাক কতা কমু নে। যাও মা, যাও। খাওন দাওন যা পারো আমার জন্য নিয়া আসো।

আইচ্ছা যাইতাছি।

কিশোরী বেরিয়ে যাওয়ার পর গভীর আর্তির গলায় মতি বলল, আল্লাহ আল্লাহ, আমারে বাঁচাও আল্লাহ। আমারে তুমি বাঁচাও।

বাবার জন্য খাওয়া-দাওয়া

দাদি এখনও ফেরে নি।

এই সুযোগ। ঘরে ঢুকে মুড়ির টিন থেকে নিজের গামলাটা প্রায় ভরে নিল কিশোরী। খেজুড়ি গুড়ের পট থেকে বড় একদলা গুড় নিল। এলুমিনিয়ামের একটা জগ ভরে পানি নিয়ে ঘর থেকে যখন বেরুচ্ছে, দূরে দাদিকে দেখা গেল এদিকপানে আসছে।

কিশোরী দ্রুত তার জিনিসপত্র নিয়ে পরিত্যক্ত ঘরটায় এসে ঢুকল। দাদি তাকে দেখতেই পেল না।

ঘরে ঢুকেই খড়নাড়ার ওদিকটায় চলে এল কিশোরী। মতি অসহায়, কাতর মুখে বসে আছে। কিশোরীর হাতে মুড়ির গামলা দেখেই ক্ষুধাক্লিষ্ট মুখ উজ্জ্বল হলো তার। হাত বাড়িয়ে গামলাটা নিল। দেও মা, দেও।

মুড়ির গামলা নিয়ে আর কোনোদিকে তাকাল না, গপাগপ খেতে শুরু করল।

খানিক তাকিয়ে মতিকে দেখল কিশোরী, তারপর আচমকা খিলখিল করে হাসতে লাগল।

মতি অবাক। কী হইছে মা ?

কিছু না।

হাসো ক্যান ?

তোমার কারবার দেইখা হাসি বাবা। তোমার কারবার দেইখা।

কথা বলতে বলতেও হাসছিল কিশোরী।

মতি বলল, আমি আবার কী করলাম ?

মতির মুখোমুখি বসল কিশোরী। আপনা মাইয়া ফালাইয়া চইলা গেলা, দশ বারো বছর বাদে ফিরত আইলা। তাও আইতা না, আমি ফোন কইরা আনাইছি। তয় এত বছর পর আইসাও আপনা মায়ের লগে দেখা করতাছো না। চোরের মতন পলাইয়া রইছো। বাবা, তুমিও কি আমার মতন পাগল ?

মতি কথা বলল না। এক পলক কিশোরীর দিকে তাকিয়ে আবার খেতে লাগল।

কিশোরী বলল, তোমার কারবার দেইখা আমি বুজছি।

কী বুজছো, মা ?

তুমিও আমার মতন পাগল। এর লেইগাই দাদি আমারে কয়, পাগলের ঘরের পাগল। বাপ পাগল হইলে মাইয়া তো পাগল হইবই।

মতি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। না গো মা, আমি পাগল না।

পাগলে কোনোদিন কয় সে পাগল ?

তুমি তো কও।

হ আমি কই। আমি অন্য পাগলের মতন না। তুমি অন্য পাগলের মতন।

না গো মা। আমি, আমি...

তুমি কী ?

অহন থাউক। পরে তোমারে একদিন কমু নে।

মতি আবার মুড়ি মুখে নিল। এই বাড়িতে কে কে থাকে মা ?

মুখের মিষ্টি একটা ভঙ্গি করল কিশোরী। ওই দেখো বাবায় কয় কী ?

খারাপ কিছু কইলাম, মা ?

না খারাপ কও নাই। বলদের মতন কইছো। আরে এই বাড়িতে আমি আর তোমার মায় থাকি। যার কাছে আমারে রাইখা তুমি চইলা গেছিলা।

মতি চুপ করে মুড়ি চিবাতে লাগল।

কিশোরী বলল, আর কেউ থাকে না।

তারপরই ভুল শুধরালো। ও আরেকজন থাকে। মন্টুমামা। সে হইল বাড়ির দারোয়ান।

বুজছি। তয় তুমি মা আমার কথা কেউরে কইয়ো না।

আইচ্ছা কমু না।

পলাইয়া পলাইয়া আমারে একটু খাওন দিয়া যাইয়ো।

আইচ্ছা বাবা, দিমু নে। তুমি কোনো চিন্তা কইরো না। তোমার মাইয়া থাকতে তুমি না খাইয়া মরবা না। তয় তুমি যে এতদিন বাদে আইলা বাবা, আমার জইন্য কিছু আনো নাই ? মাইয়ারে দেখতে আইলে বাবারা কোনোদিন খালি হাতে আসে ?

একথায় মতি বেশ থতমত খেল। তারপরই নিজেকে সামলাল। আনছি মা, আনছি।

সত্যই আনছো ?

হ।

তয় দেরি করতাছো ক্যান ? দেও আমারে ?

পরে দিমু নে মা।

বলেই কিশোরীর মাথায় গভীর মমতায় একটুখানি হাত বুলিয়ে দিল। এই মমতাটুকু পেয়ে মন একদম ভরে গেল মেয়েটির। আদুরে গলায় বলল, আইচ্ছা বাবা। যহন ইচ্ছা দিও।

ততক্ষণে মুড়ির গামলা খালি করে ফেলেছে মতি। পেট ভরে গেছে তার। ঢক ঢক করে জগ থেকেই পানি খেল সে। তারপর পরিতৃপ্ত মুখে বলল, তুমি আমারে বাঁচাইলা মা। আল্লায় তোমারে বাঁচাইয়া রাখুক।

মতির থুতনি ধরে শিশুর মতো নেড়ে দিল কিশোরী। আদুরে মায়ের গলায় বলল, ওরে আমার বাবাটারে, আমার সোনাটারে। আল্লায় তোমারেও বাঁচাইয়া রাখুক।

খালি গামলা আর জগ নিয়ে উঠল কিশোরী। আমি অহন যাই বাবা। দাদি মনে হয় এতক্ষণে আইসা পড়ছে। পরে সুযোগ মতন আবার আমুনে। তুমি কোনো চিন্তা কইরো না। তোমার খাওন দাওন আমি যেমনে পারি দিয়া যামু নে। তুমি অহন ঘুমাও।

অতি সাবধানে দরজা ফাঁক করে বেরিয়ে গেল কিশোরী।

মতি তাকিয়ে ছিল মেয়েটির দিকে। সে বেরিয়ে যেতেই মনে মনে বলল, মাইয়াটার দেখি বিরাট সমস্যা। আমারে ওর বাপ মনে কইরা বইসা রইছে। এখন তো আমার আর কিছু করার নাই। এই সুযোগটাই আমার লওন লাগবো। নিজেরে বাঁচান লাগবো। তয় মাইয়াটারে কী দেই ? কী দিয়া কই, মাগো, আমি তোমার জইন্য এই জিনিসটা আনছি।

মতির গলায় অতি সস্তা ইমিটেশানের একটা চেন আছে। দেখতে একেবারেই সোনার চেনের মতো। সেই চেনটায় হাত দিল সে।

কিশোরীর রহস্যময় আচরণ

দুপুরবেলা খেতে বসে ভাত মুখে দিচ্ছে না কিশোরী।

সামনে থালা, মুখোমুখি বসা দাদি। দাদি নিজের মতো করে খাচ্ছে। কিশোরী যে খাচ্ছে না এটা তিনি খেয়াল করলেন

খানিকপর। অবাক হয়ে কিশোরীর দিকে তাকালেন। কী হইল ?

কিশোরী সরল গলায় বলল, কী ?

ভাত খাছ না ?

আমি অহন খামু না।

তয় কখন খাবি ?

পরে।

পরে কখন ?

ভাত খাইয়া তুমি যখন ঘুম দিবা, তখন।

ক্যান ?

ভাতের থালা সরিয়ে রেখে কিশোরী বলল, আমার ইচ্ছা।

দাদি ভাত তরকারি মাখাতে মাখাতে বললেন, তুই কোনোদিন ভালো হবি না। পাগলের গুষ্ঠি পাগলই থাকবি।

হ কইছে তোমারে! আমি ভালো হইয়া গেছি না ?

তুই হইছস ঘোড়ার আণ্ডা।

ঘোড়ার আণ্ডা না, আমি অহন ভালো মাইয়া। কিশোরী পাগলনি না, কিশোরী ভালোনি।

ভালোনি আবার কী ?

যেই মাইয়া পাগল সে হইল পাগলনি আর যেই মাইয়া ভালো সে হইল ভালোনি।

তুই যে পাগল এইটা হইল তার প্রমাণ। ভালোনি বইলা কোনো কথা নাই।

আছে।

চাখ তুলে কিশোরীর দিকে তাকালেন দাদি। কিশোরীকে থামানোর একটা কায়দা তার জানা আছে, বাপের প্রসঙ্গ তোলা। ওই একটা ব্যাপারে সীমাহীন কাতর কিশোরী। বাবার কথা বলে যে-কোনো ক্ষেত্রে থামিয়ে দেওয়া যায় তাকে।

এখনো সেই প্রসঙ্গ তুললেন দাদি। তোর মতন পাগলনির কাছে তোর বাপে জীবনেও আইবো না।

শুনেই খিলখিল করে হেসে উঠল কিশোরী। এমন হাসি, সেই হাসি আর থামতেই চায় না। হেসে একেবারে কুটিপটি।

দাদি বিরক্ত হলেন। এই চুপ কর, চুপ।

কিশোরী তবু হাসে।

দাদি এবার বিরাট ধমক দিলেন। চুপ করলি ?

কিশোরী আগের মতোই হাসতে হাসতে বলল, তোমার কথা ঠিক না দাদি।

কোন কথা ঠিক না ?

ওই যে কইলা বাবায় আইবো না।

ঠিকই তো কইছি। এই পাগলনির কাছে কোনো বাপে আসেনি ?

কিশোরী আড়চোখে দাদির দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বলল, বাবায় তো আইছে।

দাদি চমকালেন। কী ?

না কিছু না।

ভাতের থালা পড়ে রইল, কিশোরী চঞ্চল ভঙ্গিতে বেরিয়ে গেল।

দাদির তখন বিরক্তিতে চেহারা বদলে গেছে। মনে মনে বললেন, কোন আজাব যে আমার কান্ধে চাপায়া দিছে আল্লায়। এখন তেরো চৌদ্দ বচ্ছর বয়স মাইয়ার, দিনে দিনে সিয়ানা হইব। বিয়াশাদি দেওন লাগবো। এই পাগলনিরে বিয়া করবো কে ? আল্লায়ই জানে কী আছে কপালে ?

খাওয়াদাওয়া শেষ করে চাপকল তলায় গিয়ে থালাবাসন ধুয়ে আনলেন দাদি। হাতের কাজটাজ সব শেষ করে তাঁর স্বভাব মতো চৌকিতে উঠলেন। শুয়ে পড়ার পর বেশিক্ষণ লাগে না তাঁর ঘুম আসতে।

এখনও তাই হলো। কয়েক মিনিটের মধ্যে গভীর ঘুমে ডুবে গেলেন। নিঃশ্বাস প্রশ্বাস ভারী হয়ে এল তাঁর।

এই সময়টার জন্য অপেক্ষা করছিল কিশোরী। সে ছিল আশপাশেই। হাসনুহেনা ঝোপের ওদিকটায় লুকিয়ে ছিল। দাদি তাকে দেখতে পায় নি, সে পুরোপুরি দেখতে পেয়েছে দাদিকে। হাতের কাজ শেষ করে দাদি ঘুমিয়ে পড়ার পর পা টিপে টিপে সে ঘরে ঢুকেছে। ঢুকে দেখে তার ভাতের থালাটা ঢেকে রেখেছেন দাদি। সেই থালা আর এলুমিনিয়ামের পানির জগটা নিয়ে, যেমন নিঃশব্দে ঘরে ঢুকেছিল সে, ঠিক সেই রকম নিঃশব্দেই বেরিয়ে গেল। বেরিয়ে হনহন করে হেঁটে সোজা সেই পরিত্যক্ত ঘরে।

দুপুর হয়েছে অনেক আগে। মতির পেট খিদায় চো চো করছে। কিশোরীকে ভাতের থালা আর পানির জগ নিয়ে ঢুকতে দেখেই দশ-পনেরো দিনের দাড়ি গোঁফঅলা মুখে হাসল। আনছো মা, ভাত আনছো ?

ভাতের থালা মতির সামনে নামিয়ে কিশোরী বলল, হ বাবা। আনছি। এই নেও, খাও।

মতি আর এক মুহূর্ত দেরি করল না। পিছন ফিরে জগের পানিতে চট করে হাতটা কোনোরকমে ধুয়েই গপ গপ করে খেতে শুরু করল।

কিশোরী মুগ্ধ হয়ে বাবার খাওয়া দেখছে। দুপুরে সে খায় নি। তারও খিদা লেগেছে। হঠাৎ মতির দিকে মুখ বাড়িয়ে হা করল সে।

ব্যাপারটা বুঝতে পারল না মতি। খেতে খেতে বলল, কী ?

আমি ভাত খাই নাই বাবা।

ক্যান ?

আমার ভাগের ভাতই তোমার লেইগা লইয়া আইছি।

কও কী ?

হ বাবা। আমারে একটু খাওয়াইয়া দেও।

মতি কী রকম একটু অপরাধ বোধ করল। তুমি নিজে না খাইয়া তোমার ভাত আমার জইন্য লইয়া আইছো মা ?

হ বাবা। বেশি ভাত পামু কই ? দাদি তো খালি তার আর আমার ভাত রান্ধে।

বুজছি মা, বুজছি। হা করো।

কিশোরী শিশুর ভঙ্গিতে হা করল। মতি তার মুখে ভাত তুলে দিল। সেই ভাত মুখে নিয়ে কী যে আনন্দ মেয়েটির। মুগ্ধ গলায় বলল, জীবনে পয়লা বাপের হাতে ভাত খাইলাম! একবার খাইয়াই পেট ভইরা গেল।

সত্যই মা ?

হ বাবা, সত্যই। তোমার হাতে একনলা ভাত খাইয়া পেট একদম ভইরা গেছে। আর খাওন লাগবো না।

না মা, আর একবার খাও।

কিশোরী হাসল। দেও বাবা, দেও। একবার খাওন ভালো না। একবার খাইলে মানুষ পানিতে ডুইবা মরে।

কে কইছে তোমারে ?

আর কে কইবো ? বুড়ি। আমার দাদি।

বুজছি মা, বুজছি। নেও হা করো।

কিশোরী আবার হা করল, মতি তার মুখে আবার ভাত তুলে দিল।

মুখের ভাত গিলে কিশোরী বলল, মার কথা আমার মনে হয় না বাবা। খালি মনে হয় তোমার কথা। তুমি যদি ছোটকাল থিকা আমার কাছে থাকতা, আমি যদি থাকতাম তোমার কাছে, বাবা গো, তয় আমি পাগল হইতাম না। আমি খুব ভালো মাইয়া হইয়া থাকতাম।

কিশোরীর কথা শুনে মতির বুকটা মোচড় দিয়ে উঠল। মনে মনে বলল, আহা রে অভাগিনী মাইয়া। তোর বাপ কোথায় আছে কে জানে! যদি মইরা গিয়া থাকে তয় অন্যকথা। বাইচা থাকলে তার মতো অভাগা বাপ আর ইহজগতে নাই। এই রকম একটা মাইয়ার আদর সোহাগটা সে পাইলো না। মাইয়াটাও পাইলো না বাপের আদর সোহাগ। আহা রে!

মতির খাওয়া শেষ হওয়ার পর কিশোরী বলল, অহন তুমি ঘুমাও বাবা। আমি যাই। রাইতে কেমনে যে তোমার ভাত দিয়া যামু ওইটা বুজতাছি না। দাদির হাতে ধরা পইরা গেলে অসুবিধা।

মতি একেবারে হা হা করে উঠল। না মা, না। ওইটা কইরো না। আমি যে এখানে আছি এইটা যেন কেউ টের না পায়। রাইতে খাওন নিয়া তোমার আসতে হইব না। এখন যা খাইছি এতেই চলবো। আবার কাইল সাবধানে একটু ভাত দিও মা।

আইচ্ছা বাবা, আইচ্ছা।

ভাতের শূন্য থালা আর জগ নিয়ে সাবধানে নিজেদের ঘরে ফিরল কিশোরী। দাদি তখনও আগের মতো ঘুমাচ্ছে। হঠাৎই ঘুমটা ভাঙল তাঁর। বালিশ থেকে মাথা তুললেন না তিনি, তবে নিঃশব্দে মুখ ঘুরিয়ে দরজার দিকে তাকালেন। কিশোরীকে ওসব জিনিস নিয়ে ঘরে ঢুকতে দেখলেন, থালা জগ নামিয়ে যেমন চোরের মতো ঢুকেছিল সে তেমন চোরের মতোই বেরিয়ে গেল।

দাদির মনে সন্দেহ ঢুকল। ঘটনা কী ? ভাতের থালা আর জগ লইয়া কই গেছিল কিশোরী ? এমন চোর চোর ভাব ক্যান পাগলনির ?

নাচে গানে ভরপুর

এই বাড়িতে কিশোরীর নিজস্ব একটা জায়গা আছে।

বাড়ির পশ্চিম দিককার পুকুরের ওপারে নানা রকম পাতাবাহার কামিনী হাসনাহেনা বেলি এইসব ফুলের ঝোপের আড়ালে সুন্দর এক চিলতে ঘাসের জমি। সেখানে কখনও কখনও একা এসে বসে থাকে কিশোরী। সই পাতাবার পর নেড়িকুত্তাটাও দুয়েকদিন তার পিছু পিছু এসেছে। সবুজ ঘাস জমিটুকুর পরেই উঁচু দেয়াল। খুবই নিরিবিলি নির্জন জায়গা। পুকুরের দিক থেকে হাওয়া আসে, গাছপালা থেকে আসে পাখির ডাক। আর দিনদুপুরেও ঝিঁঝিঁ ডাকছে তো ডাকছেই।

মতিকে আজ সেই জায়গাটায় নিয়ে এল কিশোরী।

এখন সকাল এগারোটার মতো বাজে। ঘর থেকে হাত ধরে মতিকে টেনে বের করেছে কিশোরী। সে বেরুতে চায় নি। কিশোরী বলেছে, তোমার কোনো ভয় নাই বাবা। আমি আছি না ? কেউ তোমারে দেখবো না। তুমি আমার কথা বিশ্বাস করো। আমি তোমারে এমুন একখান জায়গায় লইয়া যামু, দুনিয়ার কেউ তোমারে দেখবো না। ওখানে বইসা আমরা বাপ মাইয়ায় গল্প করুম।

পাগল মেয়েটির আবদার ফেলতে পারে নি মতি। তার সঙ্গে বেরিয়েছে। বেরিয়েই অতি সাবধানী চোখে এদিক-ওদিক তাকাতে শুরু করেছে। ব্যাপারটা খেয়াল করল কিশোরী। তোমার কী হইছে, বাবা ?

কই কী হইছে, মা ?

তোমার এমুন চোর চোর ভাব ক্যান ?

না মা, কিছু না।

তোমারে আমি একটা কথা কই ?

কও মা, কও।

তুমি আমার কথা শুনবা ?

আগে কও।

তুমি আমার লগে দাদির কাছে চলো।

না মা, না।

আরে লও। তোমার কোন জায়গায় কী সমস্যা দাদি সব ঠিক কইরা দিবো নে।

না গো মা, না। সে কিছুই ঠিক করতে পারবো না।

তারপরই কথা ঘুরালো। মাগো, তোমার দাদি এখন কোথায় ?

গেটের ওইদিকে গিয়া বইসা রইছে।

ক্যান ?

গেট পাহারা দেয়।

সে গেট পাহারা দিবো ক্যান ? দারোয়ান সাবে কই ?

'দারোয়ান সাব' কথাটা শুনে খিলখিল করে হেসে উঠল কিশোরী। দারোয়ান সাব না তো, সে তো মন্টুমামা।

হ মা, বুজলাম। সে তোমার মন্টুমামা। তয় সে এখন কোথায় ?

তুমি বোজো নাই ?

না।

সে গেছে বাজারে। এজন্যই দাদি গেট পাহারা দিতাছে।

গেট বন্ধ ?

হ। মন্টুমামায় বাজার থিকা আইসা দাদিরে চাচি চাচি কইরা ডাকলে তয় দাদি গেট খুইলা দিব।

কতক্ষণ লাগতে পারে তার বাজার কইরা আসতে ?

দেড়-দুই ঘণ্টা।

তয় ভালো। তয় ঠিক আছে।

মতি অনেকটা স্বাভাবিক হলো। মুখে বেশ একটা স্বস্তির ভাব এল তার। কিশোরীর সঙ্গে পুকুরের পশ্চিমপারের সুন্দর জায়গাটায় চলে এল।

কিশোরী বলল, তয় যে ঠিক আছে কইলা বাবা, খুশি হইয়া কইছো না ?

হ মা।

খুশিতে অহন কী করবা ?

কী করুম ?

কিশোরীর মুখে দুষ্টুমির হাসি। নাচবা ?

খুশিতে নাচবা ?

এই প্রথম যেন মেয়েটিকে খুব খেয়াল করে দেখল মতি। তেরো-চৌদ্দ বছর বয়সের রোগাপাতলা কিশোরী মেয়েটি। গায়ের রং শ্যামলা। একটু লম্বা ধাচের মিষ্টি মুখখানি। হাসলে চারদিক যেন আলোকিত হয়ে যায়। চোখ দুটো কী যে মায়াবী। চৈত্রমাসের সকাল শেষ হয়ে আসা বেলায়ও তার নাকের তলায় চিনির রোয়ার মতো মৃদু ঘাম। পরনে আকাশির ওপর সাদা ফুল তোলা সালোয়ার কামিজ। ওড়নাটা মাফলারের মতন গলায় প্যাচানো।

কিশোরীর হাসি দেখে মতিও হাসল। আমি কইলাম নাচতে পারি।

কী ?

হ। তুমি যদি কও, তয় তোমারে নাচ দেখামু।

সত্যই ?

তয় মিছানি ?

গানও গাইতে পারো, বাবা ?

হ তাও পারি।

কও কী!

সত্যকথাই কই মা। নাচগান দুইটাই পারি। আমি তো যাত্রাদলে পাট করতাম।

সঙ্গে সঙ্গে মতির একটা হাত ধরল কিশোরী। ও বাবা, আমারে একটু নাচ দেখাও না। আমারে একটু গান গাইয়া শোনাও না ?

মতি হাসল। সিনেমার মতন নাচে গানে ভরপুর কইরা ফালামু ?

হ বাবা। নাচো, গান করো। আমি দেখি।

তয় তোমার ওড়নাখান দেও মা।

ওড়না দিয়া কী করবা ?

দেও না। তারবাদে দেখো।

গলা থেকে ওড়না খুলে দিল কিশোরী। সেই ওড়নায় ঘাড়মাথা ঢেকে মেয়েদের মতো ঘোমটা দিল মতি। তারপর হাত পা নাড়িয়ে সুন্দর ভঙ্গিতে নাচতে লাগল। দরাজ গলায় গানও ধরল।

মেঘ ঘুটঘুইট্টা আন্ধার রাতি
আকাশে নাই চাঁন
তোমার লাইগা কান্দে আমার প্রাণ
ও কন্যা গো
তোমার লাইগা কান্দে আমার প্রাণ

মতির নাচ দেখে, গান শুনে এত মুগ্ধ কিশোরী, মতির দিক থেকে আর চোখই সরাতে পারে না। অপলক চোখে তাকিয়ে থাকে। আজকের আগে এত সুন্দর দৃশ্য সে আর দেখে নি।

মতি ধরা পড়ে গেল

রাতের খাওয়াদাওয়া শেষ করে চৌকিতে পা ঝুলিয়ে বসেছে কিশোরী। শিশুর ভঙ্গিতে পা

দোলাচ্ছে। শুতে যাওয়ার আগে একটুকরা পান মুখে দেওয়ার অভ্যাস দাদির। সেই পানটা মাত্র মুখে দিয়েছেন, কিশোরী বলল, বাবায় যা সোন্দর নাচে দাদি, যা সোন্দর গান গায়। দেখলে পাগল হইয়া যাইবা।

পান চিবাতে চিবাতে নির্বিকার গলায় দাদি বললেন, তোর কোন বাপ ?

আরে আমার আপনা বাপ।

কী ?

হ তোমার আপনা পোলা।

তারপরই জিভ কাটল কিশোরী। আপনমনে বিড়বিড় করে বলল, যাহ্, কইয়া ফালাইলাম তো! বাবায় না কইছিল তার কথা য্যান কেউরে না কই!

কিশোরীর বিড়বিড়ানি খেয়াল করলেন দাদি। কী কচ বিড়বিড় কইরা ?

কিশোরী নির্বিকার গলায় বলল, না কিছু না।

আমার মনে হয় কিছু একটা ঘটনা আছে।

হ আছে।

কী ঘটনা ক তো ?

ঘটনার নাম ঘোড়ার আণ্ডা।

কিশোরী আর কথা বলল না। শুয়ে পড়ল। ঘটনা ঘটল সকালবেলা।

নাশতা খাওয়ার পরই দাদি গেছেন মন্টুর ঘরের ওদিকে। মন্টুর কাল রাত থেকে জ্বর। আজ নিজের রান্নাবান্না সে করতে পারবে না। দাদি তাকে বলতে গেছে, তোর রান্নাবাড়ার দরকার নাই মন্টু। তুই শুইয়া থাক। আমি তোর ভাত পানি দিয়া যামু নে। মাথায় পানি দিতে হইলে কইছ, আমি আইসা মাথায় পানি দিয়া যামু নে।

এই সুযোগে মতির জন্য গুড়মুড়ি আর পানির জগ নিয়ে রওনা দিয়েছে কিশোরী। ঠিক তখনই মন্টুর ঘর থেকে বেরিয়ে নিজের ঘরের দিকে আসছেন দাদি, কিশোরী তাঁকে দেখতে পেল না কিন্তু তিনি কিশোরীকে দেখলেন। দেখে সামান্য সময় কিছু ভাবলেন তারপর কিশোরী কোনদিকে যায় খেয়াল করলেন।

কিশোরী গিয়ে পরিত্যক্ত ঘরটায় ঢুকল।

দাদি ধীর পায়ে হেঁটে সেই ঘরের দরজায় এসে দাঁড়ালেন। চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন।

মতি তখন তার খড়নাড়ার বিছানায় বসে গুড়মুড়ি খাচ্ছে আর তার সামনে বসে কথা বলছে কিশোরী। বাবা...

কও মা।

এমনে পলাইয়া থাকন তোমার ঠিক হইতাছে না। আমি রোজই দাদির কাছে ধরা খাইতে খাইতে বাইচা যাইতাছি।

আর বেশিদিন না মা। আমি এখন থিকা...

কিশোরী সন্দেহের গলায় বলল, তুমি এখান থিকা কী করবা ?

না মানে...

চইলা যাইবা, বাবা ? আমারে ফালাইয়া চইলা যাইবা ?

গভীর মমতায় কিশোরীর মাথায় একটা হাত রাখল মতি। আরে না, আমার মাইয়াটারে ফালাইয়া আমি কই চইলা যামু, কও তুমি ? কও মা ?

মতির সেই হাতটা দুহাতে ধরল কিশোরী। হ আর কোনোদিন আমারে ছাইড়া তুমি যাইবা না। তুমি ফিরত আইছো দেইখা আমি ভালো হইয়া গেছি। আমি আর এখন পাগল না। তুমি চইলা গেলে আবার পাগল হইয়া যামু। পুরা পাগল হইয়া যামু। আর ভালো হমু না।

ধীর পায়ে মতি আর কিশোরীর সামনে এসে দাঁড়ালেন দাদি। তুমি কে ?

দুজনের কেউ প্রথমে খেয়াল করে নি দাদিকে। গলার আওয়াজ শুনে তাঁর দিকে তাকাল। মতির মুখে মুড়ি ছিল, মুড়ি চিবাতে ভুলে গেল সে। ফ্যালফ্যাল করে দাদির দিকে তাকিয়ে রইল।

কিশোরী সরল গলায় বলল, যাহ বাবা! তুমি তো ধরা খাইয়া গেছো ?

দাদি আবার বললেন, তুমি কে ?

মতি কথা বলল না। মুখের মুড়ি গিলে ফেলল।

কিশোরী ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে। বলল, ওই দেখো দাদি কয় কী ? আরে আপনা পোলারে তুমি চিনতে পারতাছো না ? এইডা তোমার পোলা। আমার বাপ। ওই যে মন্টুমামারে দিয়া ফোন করাইলাম, তারপরই তো বাবায় আইসা পড়ছে।

দাদি শীতল গম্ভীর গলায় বললেন, তুই চুপ কর কিশোরী। এইডা আমার পোলা না!

কও কী তুমি, দাদি ?

হ ঠিক কথাই কই। এইডা তোর বাপ না!

এবার হঠাৎ করে ক্ষিপ্ত হয়ে গেল কিশোরী। বিরাট এক ধমক দিল দাদিকে। চুপ কর বুড়ি। একদম চুপ। তুই তোর পোলারে না চিনতে পারছ আমি আমার বাপরে ঠিকই চিনি। এইডাই আমার বাপ।

মতিও ততক্ষণে দাঁড়িয়েছে। কিশোরী তার একটা হাত ধরল। প্রবোধ দেওয়ার গলায় বলল, দাদির কথায় তুমি রাগ কইরো না বাবা। তুমি খাও। তুমি পেট ভইরা গুড়মুড়ি খাও।

তারপর মতির পিঠে হাত বুলাতে বুলাতে শিশুকে যেমন আদর করে মা ঠিক সেই ভঙ্গিতে আদর করতে করতে বলল, ওরে আমার বাবাটারে...। খাও বাবা, খাও।

মতির চোখ দুটো তখন ছলছল করছে।

তারপর হঠাৎ যেন নিজেকে সামলাল সে। কী রকম চটপটে হয়ে উঠল। কিশোরীকে বলল, মুড়ির গামলা আর পানির জগ লইয়া তুমি ঘরে যাও মা। আমি আমার মা'র লগে একটু কথা কই। এতদিন পর মা পোলায় দেখা হইছে, মায় আমারে রাগ কইরা চিনতে পারতাছে না, আমি তার লগে একটু একলা একলা কথা কই মা। তুমি যাও। তুমি আর এখন আইসো না। আমি ডাকলে পরে আইসো।

মতির কথা শুনে খুশি হলো কিশোরী। আইচ্ছা বাবা, আইচ্ছা। তোমরা মা পুতে কথা কও। আমি যাই।

গুড়মুড়ির গামলা আর পানির জগ নিয়ে বেরিয়ে গেল কিশোরী।

এবার দাদির মুখের দিকে তাকাল মতি। এখন যা বলবার বলেন আমারে।

দাদি আবার বললেন, তুমি কে ?

আমার নাম মতি। মতিউর রহমান।

বাড়ি কই ?

মানিকগঞ্জের হরিনা।

এখানে, এই বাড়িতে কীভাবে আইছো ?

আমার কপাল আমারে টাইনা আনছে। তয় আমি চোর-ডাকাইত বা শয়তান বদমাইশ না। যাত্রাদলে পাট করি। দলের লগে জিলায় জিলায়, গ্রামে বন্দরে, হাটে বাজারে ঘুইরা বেড়াই। আছিলাম শেরপুরে। শেরপুর থিকা কপালের টানে টানে এইখানে আইসা ঢুকছি।

কীভাবে এইবাড়িতে সে ঢুকেছে, কিশোরীর সঙ্গে কীভাবে দেখা ইত্যাদি ইত্যাদি সবই দাদিকে সে খুলে বলল। দাদি চিন্তিত চোখে তাকিয়ে আছেন মতির দিকে।

মতি বলল, এই কয়দিনে আমি সত্য সত্যই মাইয়াটার বাপ হইয়া গেছি। আর ও হইয়া গেছে আমার মাইয়া। তয় আপনেরে আমি কই, আপনে আমার মার মতন। মাইয়াটা আমারে তার বাপ জানছে জানুক। আমি ওর বাপ না, আমি আপনের পোলা না, এইটা বইলা ওর মনে আপনে কষ্ট দিয়েন না। ভারি দুঃখী মাইয়াটা। বাপ ছাড়া দুনিয়ার কিচ্ছু বোঝে না। আমি যদি সত্য সত্যই ওর বাপ হইতাম, মাগো, দুনিয়াতে আমার আর কিছু চাওয়ার থাকতো না। আপনে ওরে কিছু বুঝতে দিয়েন না। পাগল মাইয়াটা ভালো থাকুক।

দাদি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। কিন্তু এই ভালো কয়দিন বাজান ? তোমারে আমরা চিনি না, জানি না। তুমি তো আর চিরকাল আমগ কাছে থাকবা না। আমার পাগল নাতিনটার বাপ হইয়া থাকবা না।

সেইটা তো ঠিকই। তয় সম্ভব হইলে আমি ওর বাপ হইয়া থাইকা যাইতাম মা। আপনের পোলা হইয়া থাইকা যাইতাম। আমি কোনোদিন মা বাপের আদর পাই

নাই। অনাথ এতিম আছিলাম। গ্রামের এইবাড়ি ওইবাড়ি ঘুইরা বেড়াই। দুই চাইর মাস একেক বাড়িতে থাকি, তাগো কাম কাইজ করি। একদিন তারা হয়তো বিদায় কইরা দেয়, যাই অন্য বাড়িতে। এইভাবে দিন কাটে। তখন পোলাপান বয়েস। গ্রামের বাজারে যাত্রাদল আইলো। গেছি যাত্রা দেখতে। এত ভালো লাগল কারবারটা। অধিকারির হাতে পায়ে ধইরা তার দলের লগে গ্রাম ছাড়লাম। তারপর পঁচিশ-তিরিশটা বছর এই দলেই আছিলাম। জীবনটা খারাপ কাটতাছিল না। বিয়াশাদি করি নাই, ঘরসংসার নাই, কোনো পিছুটান নাই। হঠাৎ বিরাট এক বিপদ আইসা পড়লো মাথায়।

দাদি কোনোরকমে বললেন, কী বিপদ?

দলে অধিকারির ছোটভাই আছিল। লোকটা বদস্বভাবের। মদপানি খায়। দলের মেয়েগুলির সঙ্গে ফুর্তি-ফার্তা করে। আমরা কেউ তারে পছন্দ করি না। আমার সঙ্গে দুইতিনবার ঝগড়াঝাটিও হইছে। আমি এইখানে আসার তিনদিন আগে সে খুন হইছে।

কও কী?

হ। ওই যে আমার লগে ঝগড়া হইছিল, সবাই মনে করল আমিই তারে খুন করছি।

তখন তুমি ওইখান থেকে পলাইছো?

হ মা, হ। খুন না কইরাও আমি ফাইসা গেছি। দুনিয়াতে আমার তো কেউ নাই। ধরা পড়লে জেলে যামু আমি। তারপর ফাঁসি হইব। আমি কোনোরকমে পলাইছি। জানডা লইয়া পলাইছি।

দুহাতে দাদির একটা হাত ধরল মতি। মাগো মা, আপনে আমার মা। নিজের মার কথা আমার মনে নাই। তার চেহারা মনে নাই। তয় মনে হয় সে আপনের মতনই দেখতে আছিল। আমি আমার মার লগে মিছাকথা কমু না। আমি খুন করি নাই। আমি কোনো অন্যায় করি নাই। আপনে বিশ্বাস করেন, বিশ্বাস করেন আপনে।

মতি শিশুর মতো কাঁদতে লাগল।

মতির মাথায় একটা হাত রাখলেন দাদি। কাইন্দো না বাজান, কাইন্দো না। আল্লায় বিপদ দেয়, আল্লায়ই বিপদ থিকা মানুষরে রক্ষা করে। তুমি যদি নিরপরাধ হইয়া থাকো তয় তোমার কিছু হইব না।

তুমি শান্ত হও। দেখবা আসল খুনী ধরা পইড়া গেছে। তোমার বিপদ কাইটা গেছে।

তাই যেন হয় মা, তাই যেন হয়।

তয় বাজান তোমারে আমি এখন অন্যকথা কই। আমি আর কিশোরী এই বাড়ির আশ্রিতা। কিশোরী বাপ বাপ কইরা পাগল এইটা তো তুমি বুজছই। জন্মের পর থিকাই মাথায় ছিট। বাপ বাপ কইরা সেই ছিট আরো বাড়ছে। ওর বাপ, আমার একমাত্র ছেলে রতন, বাইচা আছে না মইরা গেছে জানি না। আইজ বারো তেরো বছর কোনো খোঁজখবর নাই। এই অবস্থায় কিশোরী মনে করছে তুমিই তার বাপ। দারোয়ান মন্টু কিশোরীর যন্ত্রণা থিকা বাঁচনের জন্য মিছামিছি ফোন কইরা কইছে, আমি তোর সামনে তোর বাপেরে ফোন কইরা দিলাম, সে আইসা পড়বো। তারপর ভাগ্যচক্রে তুমি এই বাড়িতে আইসা ঢুকছো। তোমারে পাইয়া কিশোরী মনে করছে তুমিই তার বাপ। মন্টুর ফোন পাইয়া তুমি আইছো।

হ মা। এইটা আমি বুজছি।

এখন তোমারে যে আমি কিশোরীর বাপ বানাইয়া এই বাড়িতে রাইখা দিমু, এইটা বাজান সম্ভব না। পয়লা কথা হইল মন্টু বিশ্বাস করবো না। আর বাড়ির মালিক সিরাজ সাহেবও তোমারে থাকতে দিব না। এইসবের থিকাও বড় ঘটনা হইল তোমার মাথায় খুনের কেস ঝুলতাছে। যদি পুলিশ দারোগারা আইসা এই বাড়ি থিকা তোমারে ধইরা লইয়া যায় তখন সিরাজ সাহেব কিছুতেই আমারে আর কিশোরীরে এই বাড়িতে রাখবো না। কইবো, আমরা তার বাড়িতে খুনিরে আশ্রয় দিছি।

মতি দুহাতে চোখ মুছল। কথা ঠিক, একদম ঠিক।

আর একখান কথা হইল, যতদিন তুমি এইখানে থাকবা, কিশোরী তোমার জইন্য আরো পাগল হইব। তোমারে যদি পুলিশ দারোগারা ওর সামনে থিকা ধইরা লইয়া যায়, তখন ওরে থামানো বহুত কঠিন হইব। পাগল মাইয়াটা বদ্ধ পাগল হইয়া যাইবো। ওরে লইয়া বিপদ আমার আরও বাড়বো।

চোখ মুছতে মুছতে ধরা গলায় মতি বলল, ঠিকই কইছেন। অন্যসব কথা বাদ, মাইয়াটা আমারে বাপ জানছে, আমিই ওর বাপ। বাপ হইয়া মাইয়ার কষ্ট আমি বাড়ামু না। আমি চইলা যামু। যেমনে আইছিলাম, অমনেই আইজ রাইতে আমি এই বাড়ি থিকা চইলা যামু।

বিদায়বেলা

বিকেলের দিকে মতিকে খুঁজতে খুঁজতে পুকুরের ওপারকার সেই জায়গাটায় এল কিশোরী।

মতি উদাস হয়ে বসে আছে। কিশোরী হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, তুমি এইখানে বইসা রইছো, আর আমি তোমারে ওই ঘরে খুঁজলাম, কত জায়গায় খুঁজলাম। তুমি এইখানে কখন আইছো, বাবা?

মতি ম্লান মুখে হাসার চেষ্টা করল। এই তো, কিছুক্ষণ আগে আসছি, মা।

বাবা, খুব আমোদের একখান খবর আছে।

কী খবর গো মা?

দাদি কইছে, তুমি তার আপনা পোলা।

সত্যই কইছে?

হ বাবা, হ। আমি বুড়িরে কইছি, তোমার আপনা পোলা না পর পোলা হেইডা আমি বুঝি না। সে আমার বাপ। আমার আপনা বাপ। কী, ঠিক কইছি না বাবা?

হ মা ঠিক কইছো। একদম ঠিক।

মতির গা ঘেঁসে বসল কিশোরী। দাদি কইছে তুমি আর কোনোখানে যাইবা না। তুমি আমগ লগেই থাকবা।

হ মা, আমি আর কোনোখানে যামু না। আমি তোমগ লগেই থাকুম।

কিশোরীর চিবুক গভীর মমতায় ছুঁয়ে দিল মতি। আমি আমার মাইয়াটার কাছে থাকুম। তারে ছাইড়া কোনোখানে যামু না।

কথাটা বলার সময় বুকটা হু-হু করে উঠল মতির।

কিশোরী হঠাৎ করে মুখ গোমড়া করল। তয় তুমি কেমুন বাপ?

ক্যান গো মা?

কইছিলা আমার জন্য কী জানি আনছো...

হ আনছি তো।

কই? সেইটা দেখি দিলা না?

খাড়াও, অহনই দিতাছি।

গলা থেকে ইমিটেশানের চেনটা খুলল মতি। এই যে দেখো চেন। এই চেন আমি তোমার জন্য আনছি মা।

চেন দেখে কী যে খুশি হলো পাগল মেয়েটা। মুগ্ধ গলায় বলল, সোনার চেন, বাবা?

মিথ্যে বলতে বুক ফেটে গেল মতির। তবু মেয়েটিকে খুশি করার জন্য বলল, হ গো মা, সোনার চেন। আমি আমার মাইয়ার জন্য সোনার চেন ছাড়া অন্য কিছু আনুম? কাছে আসো, তোমার গলায় চেনটা পরাইয়া দেই।

দেও বাবা, দেও। পরাইয়া দেও।

মুখটা মতির দিকে এগিয়ে দিল কিশোরী। গভীর মমতায় মেয়ের গলায় চেনটা পরিয়ে দিল মতি। নিজের আনন্দে ডুবে থাকা কিশোরী দেখতে পেল না, মতির চোখ দুটো জলে ভরে গেছে।

উপসংহার

পরদিন থেকে বাপটাকে আর কোথাও খুঁজে পায় না কিশোরী।

পরিত্যক্ত সেই ঘরে বাপ নেই, পুকুরের ওপারকার সেই জায়গায় বাপ নেই। দাদিকে জিজ্ঞেস করে, ও দাদি, আমার বাবারে দেখছো? বাবায় কই গেল? তারে তো কোনোখানে খুঁইজা পাই না। আমারে না বইলা সে কোথায় চইলা গেল?

দাদি কোনো কথা বলেন না। চোখের জল সামলাতে অন্যদিকে মুখ ফেরান।

কয়েকদিন জ্বরে ভুগে মন্টু এখন খুবই দুর্বল। নিজের ঘরের সামনে প্লাস্টিকের চেয়ার নিয়ে বসে থাকে। কিশোরী তার কাছে যায়। ও মন্টুমামা, আমার বাবারে দেখছো? তোমার লগে তার দেখা হয় নাই? সে আমারে ফালাইয়া কই গেল?

মতির কথা কিছুই জানে না মন্টু। কিশোরীর কথা শুনে ভাবে পাগলের প্রলাপ। জ্বরক্লিষ্ট মুখে সেই মিথ্যে ফোনের মতো করে বলে, দেখুম না ক্যান? তারে তো আমি দেখছি। তয় স্বপ্নে। যা ভাগ।

অন্য সময় হলে একথার পর মন্টুকে সে দেখে নিত। কিন্তু এখন অন্য কোনোদিকে খেয়াল নেই কিশোরীর। সে শুধু তার বাবাকে খোঁজে। হঠাৎ করে আসা বাবা হঠাৎ করে কোথায় চলে গেল!

তারপর পরিত্যক্ত ঘরটায় গিয়ে ঢোকে কিশোরী। খড়নাড়ার বিছানা তেমনই আছে। সেখানে বসে বাবার জন্য আকুল হয়ে কাঁদে মেয়েটি। মনে মনে বাবাকে ডাকে। বাবা, ও বাবা, বাবা গো। আমারে ফালাইয়া তুমি কই চইলা গেলা? তোমার জন্য আমার বুকটা যে ফাইটা যায় সেইটা তুমি বোঝো না?

কোনো কোনোদিন বিকেল হয়ে আসার বেলায় পুকুরের ওপারকার নিজস্ব জায়গাটায় চলে যায় কিশোরী। তার পিছু পিছু যায় নেড়িকুকুরটা। সেখানে গিয়ে সবুজ ঘাসের ওপর বসে থাকে কিশোরী। বাপটা যেখানে বসেছিল সেই জায়গাটায় হাত বুলায় আর চোখের জলে ভাসে। বাবা, বাবা গো, তুমি আমার সঙ্গে এমুন করলা ক্যান? আমারে খুইয়া ক্যান চইলা গেলা? তোমার জইন্য আমার অন্তরটা যে পোড়ে, তুমি বোঝো না?

বিকেলবেলার আলো এসে পড়ে মেয়েটির গলার চেনে। সেই চেনে আলতো করে হাত বুলায় পাগল মেয়েটি। চোখের জলে গাল ভেসে যায়। তার সেই আকুল করা কান্নায় গাছে গাছে ডাকতে থাকা পাখিরা থেমে যায়, হাওয়ার কাঁপন লেগেও কাঁপে না গাছের পাতারা, সুবাস ছড়াতে ভুলে যায় ফুলেরা। নেড়ি কুকুরটা অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে। মানুষের কান্নার অর্থ সে বোঝে না। ■